যজ্ঞ ও বিজ্ঞান
আর্য সমাজের সংস্থাপক, রাষ্ট্রবাদী, সমাজ সংস্কারক
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ১২৫ তম মহানির্বাণের পুণ্যলগ্নে শ্রদ্ধাঞ্জলী
(১৮২৪ - ১৮৮৩)

যজ্ঞ ও বিজ্ঞান
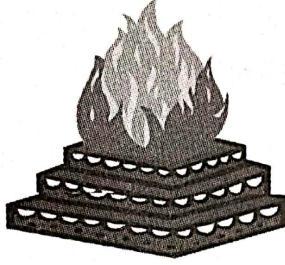
ডঃ জগদীশ প্রাসাদ, এম. এস.সি.
পি.এইচ.ডি., ডি.এস.সি. (রসায়ন শাস্ত্র)
সাহিত্য মহোপাধ্যায় (হিন্দী)
পূর্ব প্রাধ্যাপক রসায়ন-বিভাগ
মেরঠ কলেজ, মেরঠ (উঃ প্রদেশ)

অনুবাদক–
শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রেরণা দাতা

পন্ডিত অনিলকৃষ্ণ আর্য্য
(প্রেমভিক্ষু বানপ্রস্থী)
আর্য সমাজ বাসুদেবপুর, ধারেন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর

আর্থিক সহায়তা

পন্ডিত অনিলকৃষ্ণ আর্য্য (প্রেমভিক্ষু বানপ্রস্থী)
আর্য সমাজ বাসুদেবপুর, ধারেন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর

ও

বিশ্বেশ্বর মাজী ও কৃষ্ণা মাজী
গ্রাম- খামরা, পোষ্ট-অন্তলা, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর

মুদ্রক (বাংলা)

ক্রিয়েটিভ আর্টর্স, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

মূল্য

১৫.০০ (পনেরো টাকা মাত্র)

প্রকাশক (হিন্দী)

বৈদিক প্রকাশন
এন.এচ ১৭, পল্লব পুরম-২
মেরঠ-২৫০১১০ (উঃপ্রঃ), দূরভাষঃ ০১২১-৫৭০৬৫৭

প্রকাশক

শ্রী হিমাদ্রি শেখর রায়
শিক্ষক, মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল, মেদিনীপুর,
মোঃ- ৯৪৩৪২৩০০৫৬

লেখকের জীবন পরিচয়

জন্ম ঃ- ডাঃ জগদীশ প্রসাদের জন্ম শ্রাবন শুক্ল পঞ্চমী, সম্বৎ ১৯৮৫ বিক্রমাব্দ (৩১ শে জুলাই, ১৯২৮ সন), গ্রাম-পূঠড়ি, জেলা- মেরঠে (উঃপ্রঃ) হয়েছিল। তাঁর মা শ্রীমতী বহালো দেবী এবং পিতা শ্রী নারায়ণ দাস।

শিক্ষা-দীক্ষাঃ- তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিকস্থ গ্রাম টিন্ডালার পাঠশালায় হয়। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দেবনাগরী ইন্টার কলেজ, মেরঠ থেকে হাইস্কুল, মেরঠ কলেজ, মেরঠ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৪৭ খ্রি.), ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বি.এস.সি., ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়োগ থেকে সাহিত্যরত্ন এবং ১৯৫২ সনে বিরলা কলেজ, পিলানী (রাজস্থান) থেকে এম.এস.সি.(রসায়ন শাস্ত্র) পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হন। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে রসায়ন শাস্ত্রে পি.এইচ.ডি. এবং ১৯৯২ সনে মেরঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেন।

যদিও তিনি হাইস্কুল পর্যন্ত উর্দু, ইংরাজি এবং পরে বাংলা, পাঞ্জাবী, জার্মানী ও ফ্রেঞ্চ ভাষাগুলি অধ্যায়ন করেন কিন্তু হিন্দী ও সংস্কৃতের প্রতি বরাবর তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফলে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ থেকে তিনি হিন্দীতে সাহিত্য মহোপাধ্যায় (পি.এইচ.ডি) উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে ডি.লিট. উপাধি হেতু তাঁর গবেষণা পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারত, এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের হিন্দী, ইংরাজি, রাশিয়ান ও জার্মান ভাষাগুলির আন্তরাষ্ট্রীয় স্তরের গবেষণা পত্রিকাগুলিতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, হিন্দী, সংস্কৃত, ভূগোল ও শিক্ষা শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর প্রায় দেড়শত গবেষণা লেখন প্রকাশিত হয়েছে।

কার্যকালঃ- তিনি ১৯৫২-৫৩ সনে কে.ভি.ইন্টার কলেজ, মাছরায় (মেরঠ) এবং ১৯৫৩-৫৭ সনে সীতাশরণ কলেজ, খতৌলীতে (মুজফ্ফরনগর) রসায়নশাস্ত্রের লেক্চারার হিসাবে কর্মরত থাকেন। তিনি ১৯৫৭-৬০ সনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে এবং ১৯৬০-৬১ সনে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েই রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। তৎপশ্চাৎ তিনি ১৯৬১ সন থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত মেরঠ কলেজ, মেরঠ রসায়ন প্রফেসর ছিলেন এবং সেখান থেকেই ১৯৯১ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৪১ সন থেকে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন স্বয়ংসেবক। সংঘের সত্যাগ্রহী হয়ে ১৯৪৮ সন থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি মেরঠ ও আগরার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৮৬ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি সর্বশক্তি সহকারে 'সেবাভারতী' সংস্থার মাধ্যমে বাল্মীকি, জাটব ইত্যাদি বঞ্চিত শোষিত শ্রেণিদের সেবাকর্মে নিযুক্ত আছেন।

তিনি বাল্যকাল থেকে সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন। জনসেবা হেতু তিনি ১৪ বৎসর বয়সের কিশোরাবস্থাতেই আজীবন অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যা তিনি সারাজীবন পালন করে এসেছেন। তিনি মান-অপমান, ক্ষতি-লাভ, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক ইত্যাদিতে সর্বদা একসমান থাকেন। পার্থিব রূপ-সৌন্দর্য্য, ধন-ঐশ্বর্য, পদ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কখনও তাঁকে মোহগ্রস্ত করতে পারেনি।

তিনি অনেক দরিদ্র নিরাশ্রিত বালক-বালিকাদের শিক্ষা হেতু এবং গুরুকুল ও অন্যান্য সামাজিক, ধার্মিক সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। তিনি অনেক বছর ধরে দরিদ্র ও অস্পৃশ্য নামধারী বালক-বালিকাদেরকে ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিনা পয়সায় পড়িয়েছেন। তিনি ঘনিষ্ঠ মিত্রদের সুখদুঃখে সর্বদা সাহায্য করার জন্য তৎপর থাকেন।

নির্দেশক
বৈদিক প্রকাশন বিভাগ, মেরঠ (উঃপ্রঃ)

অনুবাদক শ্রী সতীশচন্দ্র মণ্ডল বিদ্যারত্নের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তক সমূহ ঃ–

প্রকাশিত	প্রকাশিতব্য
১। ঋক বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা –সম্পাদিত	১। আস্তিক- নাস্তিক সংবাদ – ওমপ্রকাশ ত্যাগী
২। সত্যার্থ প্রকাশ ও তার মূল্যায়ণ - ডঃ সত্যব্রত রাজেশ	২। আমরা গোলাম কেন হলাম ? –গৌতম গুপ্তা
৩। যজুর্বেদ ভাষ্যম্ – স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী	৩। ধর্মের পথ –মহাত্মা বেদভিক্ষু
৪। ভারত ভাগ্য বিধাতা - স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।	৪। সাধনা –স্বামী বিদ্যানন্দজী
৫। বিদ্রোহী দয়ানন্দ –স্বামী বিদ্যানন্দ।	৫। বিদ্যার্থী জীবন রহস্য – নারায়ণ স্বামী।
৬। হিন্দু সংগঠন –স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।	৬। ধর্মতত্ত্ব সার – পণ্ডিত গঙ্গা প্রসাদ উপাধ্যায়
	৭। আমি এবং আপনি – ধর্মদেব বিদ্যা বাচস্পতি
	৮। মেলা চাঁদাপুর (উত্তরপ্রদেশ) – শাস্ত্রার্থ
	৯। মেলা উদয়পুর (রাজস্থান) – শাস্ত্রার্থ
	১০। চীনের বৈদিক অতীত – বি. এন. ওক
	১১। গ্রীসদেশের বৈদিক পরম্পরা – বি. এন. ওক
	১২। প্রাচীন ইউরোপে রামায়ণ – বি. এন. ওক
	১৩। এশিয়া মহাদেশে রামায়ণ – বি. এন. ওক
	১৪। মোপালা – বীর দামোদর সাভারকর
	১৫। সামবেদ ভাষ্যম্ – স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী
	১৬। আবেস্তা-বেদ ও ইরান-ভারত – বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী
	১৭। আরবে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য – বি. এন. ওক
	১৮। পূর্বের দেশগুলিতে বৈদিক সংস্কৃতি – বি. এন. ওক
	১৯। বেদকে জানুন — অনুবাদক সতীশচন্দ্র মণ্ডল

ভূমিকা

পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টি উৎপত্তির সঙ্গেই বেদ জ্ঞান প্রদান করলেন এবং সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ হেতু যজ্ঞের সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে যজ্ঞ। যাজ্ঞবল্ক ঋষি যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম বলে অভিহিত করছেন। পৃথিবীর যা কিছু কল্যাণমূলক কর্ম সে সবকে 'যজ্ঞ' বলা হয়। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলেছেন– ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্র), বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ ও অতিথি যজ্ঞ। যদি পৃথিবীর সমস্ত নরনারিগণ এই পাঁচটি যজ্ঞ নিত্য নিয়মিত ভাবে করতে থাকেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো রোগ শোক, অ্যায়-অত্যাচার ও দুঃখ থাকে না।

বর্তমানকালে অধিকাংশ মনুষ্য এই পঞ্চযজ্ঞ বিস্মৃত হয়ে একমাত্র শারীরিক ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এই জন্য সর্বত্র দুঃখই দুঃখ দৃষ্টিগোচর হয়।

এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্র) শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ কেননা এই যজ্ঞে মানুষ্য ঘৃত, ঔষধি, সমিধা, সময়, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা নিজের ও সকলের উন্নতি হেতু আহুতি প্রদান করে। এই অগ্নিহোত্র দ্বারা আমাদের সকলের শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক দুঃখের নিরসন হয় এবং আমরা সবাই সুখ প্রাপ্ত হই।

শ্রদ্ধেয় ডঃ জগদীশ প্রসাদ অনলস পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা "যজ্ঞ ও বিজ্ঞান" নামক বইখানিতে যজ্ঞের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ তুলে ধরেছেন। যার ফলে আধুনিক, প্রগতিবাদী, নামধারী ব্যক্তি এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোক বুঝতে সক্ষম হবে যে, অগ্নিহোত্রের মাধ্যমে আমাদের এবং সারা পৃথিবীর জীব জগতের কত বেশি কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট বইখানিতে যজ্ঞ দ্বারা উদ্ধৃত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক এবং উদ্ভিজ্জ উপকারগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সপ্রমান প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস যে, এই পুস্তকখানি পাঠ করে পাঠকদের মনে যজ্ঞের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁরাও নিজের ও অন্যের জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করার জন্য অগ্নিহোত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে।

ডঃ বৈদিক প্রকাশ
নির্দেশক
বৈদিক প্রকাশন বিভাগ, মেরঠ (উঃপ্রঃ)

চৈত্র শুক্ল ১,২০২৫ বিক্রমাব্দ
(৮ই এপ্রিল, ১৯৯৯)

মুখবন্ধ

অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষ ক্রমে ক্রমে যত ভোগ বিলাসের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে, ততই নানা প্রকার দূষণগস্ত পৃথিবীতে মানুষের জীবনায়ু ও মানব সভ্যতার দীর্ঘ স্থায়িত্ব ক্রমশ হয়ে আসছে ক্ষীণ ও ক্ষীণতর। তাই মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুগামী পৃথিবীর খ্যাত রসায়নবিদ্ ও 'সাহিত্য মহাপাধ্যায়' ডঃ জগদীশ প্রসাদ, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি., ডি.এস.সি. (রসায়ন শাস্ত্র) মহাশয়ের সুদীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণিত যজ্ঞের বৈজ্ঞানিক প্রভাবে শরীর, চিত্ত, পরিবেশ ও জগতের বহুমুখী উন্নয়ন সংক্রান্ত "যজ্ঞ ও বিজ্ঞান" বিষয়ক গবেষণা পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরে সমাজের সামান্যতম কল্যাণের প্রচেষ্টায় সত্যবিদ্যা চর্চায় একাগ্রব্রতী মাননীয় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মন্ডল মহাশয়ের প্রেরণায় প্রকাশের প্রচেষ্টা সার্থক হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে হবে।

মাননীয় ডঃ জগদীশ প্রসাদ মহাশয়ের প্রাচীন ভারতের মনস্বী বেদবিদদের বৈদিক যজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ ও অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় মনস্বী অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তদৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রচিত "যজ্ঞ ও বিজ্ঞান" বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থকে সহজ সরল ও সংক্ষিপ্তকারে প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

পুস্তকটি প্রকাশে পন্ডিত অনিলকৃষ্ণ আর্য্য (প্রেমভিক্ষু বানপ্রস্থী), বিশ্বেশ্বর মাজী ও কৃষ্ণা মাজী মহোদয়ার অকৃপণ আর্থিক সহায়তা, ক্রিয়েটিভ আর্টস, মেদিনীপুর,-এর স্বল্পমূল্যে মুদ্রণে সহায়তা, কম্পিউটার মুদ্রক শ্রী কৌশিক মাইতির অক্লান্ত সাহায্য এবং স্নেহভাজন দু-জন ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষক শ্রীমান সরোজ মান্না ও শ্রীমান মনোজ লাহার মুদ্রণ সংশোধনীতে সভিনিবেশ সহায়তা আমাকে ঋণজালে চির আবদ্ধ করেছে।

পুস্তকটি সকলের মুখপাঠ্য ও বৈদিক যজ্ঞাচারে আগ্রহী হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

তাং- ০৯/০৬/২০১৯

পিতরৌ,
নেতাজীনগর, মেদিনীপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১

ইত্যোম্
শ্রী হিমাদ্রি শেখর রায়

ওম্

১. যজ্ঞ কী ?

জগৎ পিতা-সৃষ্টিকর্তা-পরব্রহ্ম চিন্তা করলেন যে, জীবদের মলমূত্র দ্বারা এই ভূমি, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা এই বায়ুমণ্ডল এবং অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত ক্রিয়াগুলির দ্বারা এবং জলকে বিভিন্ন ভাবে দূষিত করার ফলে জীবনের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব, তিনি সৃষ্টির আদিতে অগ্নি-বায়ু-আদিত্য-অঙ্গিরা ঋষিদের মাধ্যমে মানবকল্যাণ হেতু বেদের অবতারণা করলেন যার মধ্যে যজ্ঞ নামক কর্মেরও উপদেশ দিলেন। সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক বিষ্ণুরূপ যজ্ঞ দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করার উপায় তিনি "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু" বাক্যাংশে বলে দিলেন।

যজ্ঞ থেকে উত্থিত সুগন্ধিত ধোঁয়া অন্তরিক্ষের উপরে দ্যুলোক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই ভেষজগুণযুক্ত ধোঁয়া বায়ু পরিশুদ্ধ করে মেঘের মাধ্যমে জলকে নির্মল করে দেয়। এই নির্মল বর্ষাজল পৃথিবীর মলকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় এবং পর্জন্য পিতার বর্ষণ হেতু এই ভূমিমাতা শস্য শালিনী হয়ে বহুবিধ উদ্ভিদ ও জীবকে তার গর্ভ থেকে বাইরে প্রকাশ করে। এইজন্য অর্থব বেদে (১২/১/১২) ঋষি বলেছেন–

" মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ। পর্জন্য পিতা স উ নঃ পিপর্তু।"

"যজ্ঞ" শব্দটি ব্যাপক। ঋগ্বেদে এই শব্দ ৫৮০ বার, যজুর্বেদে ২৪৩ বার, সামবেদে ৬৩ বার এবং অর্থব বেদে ২৯৮ বার অর্থাৎ চার বেদে যজ্ঞ শব্দ মোট ১১৮৪ বার এসেছে।

যজ্ঞ শব্দ 'যজ্' ধাতু দিয়ে তৈরি। 'যজ্' ধাতুর তিনটি অর্থ–'যজ্ দেবপূজা সঙ্গতিকরণ দানেষু' অর্থাৎ ১। দেবপূজা ২। সঙ্গতিকরণ ও ৩। দান। সুতরাং যজ্ঞের বিভিন্ন প্রকার এইরূপ–দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্র বা হবন), ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বলিবৈশ্যদেবযজ্ঞ, অতিথিযজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ ইত্যাদিতে যজ্ঞের প্রায় সমস্ত অর্থ নিহিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনাদি কাল থেকে যজ্ঞের প্রচলন ছিল যদিও আজ প্রদীপ, মোমবাতি, ধূপবাতি তার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে যজ্ঞের একটি প্রকার-দেবযজ্ঞ সম্বন্ধে আবহাওয়া ও চিন্তা দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

২. যজ্ঞের পাঁচটি মুখ্য অঙ্গ

বৈদিক যজ্ঞের পাঁচটি মূখ্য অঙ্গ– (ক) সমিধা (খ) গোঘৃত ও ওষধি (গ) পাত্র (ঘ) মন্ত্র ও (ঙ) ভাবনা।

(ক) সমিধা : সমিধার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গো বা গো বংশের শুষ্ক গোবর যাকে ঘুঁটা বলা হয়। যজ্ঞে ভৈষজগুণ উৎপন্ন করার জন্য আম, বট, ডুমুর, পলাশ, অশ্বত্থ ও বেল ইত্যাদির কাষ্ঠ কাজে লাগানো যেতে পারে। সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি গরুর গোবরের ভেষজ গুণের সমর্থন করে। বিশ্বের সব দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগ নিবারণের জন্য গরুর গোবরের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। গরুর গোবরে মেন্থাল, অ্যামোনিয়া, ফিনাল, ইন্ডাল, নাইট্রোজেন (০.৩২%), ফসফরিস অ্যাসিড (০.২১%) ও পটাশ (০.১৬%) পাওয়া যায়।

ইতালীর জনৈক বৈজ্ঞানিক ডঃ বিগ্রেড গবেষণা করে দেখেছেন যে, সদ্য গোবরের শুধু গন্ধে জ্বর ও ম্যালেরিয়া জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। নিউয়ার্ক টাইমস্ বলছে– পুষ্টিকর আহারে পালিত গাভির গোবরের মত কীটাণুনাশক শক্তি অন্য কিছুতে নেই। গরুর গোবর দ্বারা লেপিত বস্তু এবং ঘরের দেওয়ালগুলি পরমাণু বিস্ফোরণের মত মারাত্মক বিকিরণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাছাড়া অন্তরিক্ষযানে উদ্ভুত ভীষণ তাপকে গরুর গোবর নিবারণ করতে পারে—একথা রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় প্রমাণিত। গরুর গোবরের শুষ্ক চূর্ণ ধুম্রপান করিয়ে হাঁপানি রোগ সারাতে পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকরা সচেষ্ট হয়েছেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গরুর গোবরের ঘুঁটের মধ্যে এবং সেটা জ্বালালে যে ধোঁয়া হয় তার মধ্যেও ভৈষজতত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যামান।

(খ) গোঘৃত ও ওষধি : বৈদিক যজ্ঞে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বস্তু হলো— গোঘৃত। যদিও গোঘৃত সহ কস্তুরি, কেশর, অগরু তগরু, শ্বেতচন্দন, এলাচি, জায়ফল ও জয়ত্রী ইত্যাদি সুগন্ধদায়ক, দুধ, ফল, কন্দ, চাল, গম, মাষকলাই ইত্যাদি পুষ্টিকারক; চিনি, মধু, ছোহারা ইত্যাদি মিষ্ট এবং গুলঞ্চ ইত্যাদি ওষধিগুলি বিশেষ ফলপ্রদ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবুও শুধুমাত্র গব্যঘৃত হব্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। মোষ বা অন্য পশুর ঘৃত বা উদ্ভিদ হতে উৎপন্ন ঘি যজ্ঞে ব্যবহার করলে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পায় অথচ গব্যঘৃত প্রয়োগে বায়ুদূষণ দূরীভূত হয়। এইজন্য অথর্ববেদে (২/১৩/১) শুদ্ধ গব্যঘৃত দ্বারা যজ্ঞ করলে আয়ু বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

গোঘৃত বা অন্য পদার্থগুলিসহ গোদুগ্ধও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রার্থনা মন্ত্রে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, গাভির দুধ-ঘির আহুতি দ্বারা হোম করলে আবহাওয়া শুদ্ধ হয় এবং চতুর্দশ ভুবনে আবহাওয়া সমরূপ হওয়ায় সব ভুবনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়— চতুর্দশ ভুবন গাভির শরীরে তথা পরলোকে কল্যাণ করুক।

যজ্ঞের বিভিন্নতা ও সর্বব্যাপকতা লক্ষ্য করে এমন মনে হয় যে, এই সৃষ্টি যজ্ঞের জন্য রচিত হয়েছে এবং যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য গাভির সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এইজন্য 'গাবো বিশ্বস্য-মাতরঃ' (গাভি বিশ্বের মাতা)' বাক্যের উদ্‌ঘোষ করা হয়েছে।

গোঘৃত মধ্যে কী কী পদার্থ আছে এখনও পর্যন্ত এটা সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। তবে এ যাবৎ গবেষণা করে গোঘৃতে এগারোটি অ্যাসিড, বারোটি ধাতু, দুটি ল্যাকটোজ এবং চারটি গ্যাস পদার্থ পাওয়া গেছে।

গরুর ঘি চালের সঙ্গে মিশ্রিত করে মন্ত্রোচ্চারণ সহ যখন অগ্নিহোত্র আহুতি প্রদান করা হয় তখন সেই আহুতি দহনের ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তার মধ্যে চারটি গ্যাস এখন পর্যন্ত জানা গেছে।— (ক) এথিলীন অক্সাইড (খ) প্রোপিলীন অক্সাইড (গ) ফার্মাল্ডিহাইড্ এবং (ঘ) বীটা-প্রোপিও ল্যাকটোন। গোঘৃত দহনে উৎপন্ন এই গ্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটি রোগ ও মানসিক চাপ দূর করার বিলক্ষণ সামর্থ লক্ষিত হয়।

চালে বারো প্রতিশত আর্দ্রতা এবং অবশিষ্ট শ্বেতসার থাকে। চালের কঠিন খোলসে তৈলদ্রব্য থাকে। এর মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় ওলীন এবং এলবুমিনস্ পদার্থ আছে। এই একমাত্র শস্য যা সমস্ত পৃথিবীতে উপলব্ধ ও ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞ বিশ্বধর্ম। অতএব যজ্ঞের আহুতিতে চালের সমাবেশ স্বাভাবিক।

(গ) পাত্র –যজ্ঞ করার জন্য ভূমিতে গর্ত খনন করা হোক বা লোহা তামা ইত্যাদি কোন ধাতুনির্মিত পাত্রে ব্যবহার করা হোক প্রতিটি অবস্থায় পাত্রের আভ্যন্তরিক অংশের বিশেষ আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে হোমকুন্ডের উপরের মাপ ১৬×১৬ আঙুল, নিম্নের মাপ ৪×৪ আঙুল এবং গভীরতা ১৬ আঙুল হবে। যজ্ঞকুন্ড ছোট বা বড় করতে হলে উপর, নিম্ন ও গভীর অংশের অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না। মহাভারত কালের পরে বৈদিক কর্মকাণ্ডের কিছু ত্রুটি দেখা গেল। বামমার্গ, তন্ত্রবিদ্যা ও পশুহিংসা প্রধান যজ্ঞগুলির জন্য যজ্ঞকুন্ডের আকারেও

পরিবর্তন এসে গেল।

মনোহর মাধব গোতপার দ্বারা লিখিত 'অগ্নিহোত্র' নামক পুস্তকে 'পিরামিড আকারের যজ্ঞকুন্ডের প্রতিপাদন করা হয়েছে। বইটির মতে এই আকারের যজ্ঞকুন্ড মাটি বা কোনো ধাতব পদার্থের তৈরি হতে পারে। বর্গাকার, পিরামিড আকারের তাম্রনির্মিত যজ্ঞকুন্ড সর্বশ্রেষ্ঠ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের তদন্তেও এটা প্রমাণিত হয়েছে।

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটি হলো মিশর দেশের পিরামিড যার মধ্যে প্রাচীন মিশর দেশের রাজাদের মৃতদেহ সহস্র বছর ধরে কোনো প্রকার পচন ব্যতিরেকে সুরক্ষিত রাখা আছে।

এই রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করে জনৈক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, 'সাইক্কিক ডিস্কভারিজ বিহাইন্ড আয়রন কার্টেন' নাম একখানি বই লিখেছেন যেখানে পিরামিডের আকার সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মতে— এই পিরামিডের মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি অস্তিত্ব বিদ্যমান যা কোনো বস্তুর পচন ক্রিয়া রোধ করে। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) বিজ্ঞানীদের মতে পিরামিড শক্তি সৌরশক্তির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কার্যকর হতে পারে।

পিরামিড আকারের মধ্যে সমাবিষ্ট বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি খাদ্য পদার্থ ও কাঁচা দুধ অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে সক্ষম। এই আকারের অভ্যন্তরে রক্ষিত শব বিকৃত বা পচনগ্রস্ত হয় না এবং তা থেকে দুর্গন্ধও উৎপন্ন হয় না। চেকোস্লোভাকিয়ার কারেল ড্রাবেনের মত বৈজ্ঞানিক পিরামিড আকারের গৃহ ও বাহন ইত্যাদি তৈরি করে অনুভব করেছেন যে, এই আকৃতির মধ্যে অদ্ভুৎ শক্তিগুলি খেলা করে। মানসিক দিক দিয়ে অস্থির ব্যক্তি এইরকম গৃহে বিলক্ষণ শান্তি অনুভব করে থাকে। অসুস্থ লোকেরা অন্যান্য হাসপাতাল অপেক্ষা এইরকম আকারের হাসপাতালে শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠে। প্ল্যাগ নামক বিজ্ঞানী বলেছেন যে, পিরামিড শক্তির রহস্য অতি সূক্ষ্মতরঙ্গে মাইক্রোওয়েভে নিহিত। এই মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত সূক্ষ্মতরঙ্গসম্পন্ন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। পিরামিড আকারের মাইক্রোওয়েভগুলি সিগনালের কুশল অনুনাদক (রিজনেটার)।

পিরামিড আকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তিগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির সংরক্ষণ করে। অগ্নিপাত্রে (যজ্ঞকুন্ডে) এই শক্তিগুলিই মহাকাশে নির্মিত মহাশক্তিগুলিকে কেন্দ্রস্থ করে তাদেরকে চতুর্পার্শের বায়ুমণ্ডলে বিস্তৃত করে দেয়।শুধুমাত্রা যজ্ঞকুন্ড শুদ্ধকরণের কার্য করতে পারে তখন

উচ্চভাবনাযুক্ত আহুতিপদার্থ এবং মন্ত্রধ্বনি দ্বারা বায়ুমণ্ডলে জাত ধ্বনিতরঙ্গ সমন্বিত হয়ে কত বড় মহান কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম তা নিতান্ত কল্পনার বিষয়।

উক্ত পুস্তকে দশ লক্ষ ডলারের একটি পরিকল্পনারও উল্লেখ পাওয়া যায় যা কায়রোর (মিশর) কাছে গিজেহ নামক স্থানে এক বর্ষাধিক কাল পর্যন্ত পরিচালিত করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সব ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগানো হয়ে ছিল যার কাজ ছিল পিরামিডের মধ্যে যাতায়াতকারী মহাকাশ রশ্মির (কস্‌মিক রে) রাত দিন টেপ রেকর্ড করা। এই পরিকল্পনার অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার ডঃ অম্র গোহেড় "টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া" নামক পত্রিকায় বলেছেন যে, বিজ্ঞানীরা একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আটকে গেছেন। পিরামিডের মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা আধুনিক বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকের সমস্থ জ্ঞাত নিয়মের আওতায় পড়ছে না। তিনি স্বীকার করলেন যে, পিরামিডের মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে যা বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম উলঙ্ঘন করছে।

পিরামিড আকারের পাত্রে বিধিমত যজ্ঞ করলে বায়ুমন্ডল শোধন প্রক্রিয়ায় কত অসাধারণ পরিণাম প্রাপ্ত হতে পারে তা কল্পনার বিষয় নয় বরং বাস্তবিকতা বলা যেতে পারে।

উক্ত বক্তব্য পিরামিড আকারের তামার যজ্ঞপাত্রের উল্লেখ আছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ। ইউনানী ভাষায় পায়রো বা পায়র মানে অগ্নি এবং এমিড মানে মধ্যে সুতরাং শব্দের অর্থ দাঁড়াল— সেই আকারের যার মধ্যে অগ্নি রাখা আছে।

যজ্ঞপাত্র যে কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু তামা ধাতু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ধাতব পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা সকলেই জানে। এইজন্য বিদ্যুৎ সরঞ্জামে এর ব্যবহার করা হয়। যুগোস্লাভিয়ার এক পরমাণু বিশেষজ্ঞের মতে— সব ধাতু পদার্থের মূল অণুগুলির আকার ভিন্ন ভিন্ন। তামা ধাতুর মূল অণুগুলির আকার পিরামিড সদৃশ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্রের মত। এই গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তামা ধাতুর নির্মাণ যজ্ঞপাত্র হওয়ার জন্য হয়েছে।

(ঘ) মন্ত্রঃ—

'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'— এই ক্ষুদ্র বাক্যটি স্বাধীনতা প্রেমী প্রতিটি লোকের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছিল। সে সময়টি ছিল স্বাধীনতা

আন্দোলনের সময়। সাধারণভাবে দেখলে ঐ কয়েকটি শব্দের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, কিন্তু জলদগম্ভীর স্বরে লোকমান্য তিলক যখন এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন তখন এই শব্দগুলির মধ্যে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের তপস্যা এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎকট অভিলাষার বীজ রোপন করে দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, সহজভাবে উচ্চারিত এই শব্দগুলি যার যার কান পৌঁছেছিল তার উপর মন্ত্রের মত কাজ করেছিল।

ঋষিরা তাঁদের তপশ্চরণ দ্বারা মন্ত্ররূপী বর্ণমালা শব্দ বা শব্দ সমূহকে সংসিদ্ধ করেছেন। অতএব এই শব্দগুলিতে শক্তি নিহিত আছে। যদি তিলকের বাক্যের শক্তি আমরা অনুভব করতে পারি তাহলে ঋষিদের দ্বারা সংসিদ্ধ শব্দগুলির শক্তি স্বীকার করব না কেন ?

শব্দ দুই প্রকার– (ক) নিত্য শব্দ ও (খ) কার্য শব্দ। যে শব্দ নিত্য বা যার দ্বারা সৃষ্ট কম্পন নিত্যস্বভাবের হয় তাকে নিত্য শব্দ বলে। কার্য শব্দের উদাহরণ লোকমান্য তিলকের উক্ত শব্দগুলি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে উক্ত শব্দগুলিতে সেই চৈতন্য শক্তি নেই যা স্বাধীনতার আগে ছিল। বেদের শব্দ নিত্য হওয়ায় সহস্র বৎসর পূর্বে এর মধ্যে যে শক্তি ছিল আজও তা বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। এমন নিত্য ও সামর্থ্যসম্পন্ন শব্দকেই মন্ত্র বলা হয়।

বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষা বিশ্বের সমস্ত ভাষার জননী। এর বিশিষ্ট শব্দ থেকে বিশিষ্ট ধ্বনি নির্গত হয় এবং বায়ুমন্ডলের উপর তার বিশিষ্ট প্রভাব পড়ে। যদি শব্দে পরিবর্তন হয়, তাহলে ধ্বনিতে পরিবর্তন হবে। একই অর্থসম্পন্ন বিভিন্ন শব্দগুলির দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি-কম্পন ও বিভিন্ন হবে এবং তার পরিণামও বিভিন্ন হবে। সমান অর্থের দুটি শব্দ হলেও একের পরিবর্তে অন্যটির ব্যবহার সঙ্গত হয় না। যেমন– 'অগ্নয়ে স্বাহা'-র স্থানে 'পাবকায় স্বাহা' বলা ঠিক হবে না। নিদ্বির্ধায় বলা যেতে পারে যে, যজ্ঞমন্ত্রের অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করার প্রশ্নই আসে না।

যজ্ঞের মন্ত্রে আগত 'অগ্নি', 'সূর্য', 'প্রজাপতি' শব্দ ঈশ্বরবাচক এবং এক ঈশ্বরশক্তির নানাবিধ তেজগুণের বর্ণনা করে। এই মন্ত্রগুলির অর্থ এইরূপ–আমি অগ্নি, বায়ু, সূর্য ও প্রজাপতিকে আহুতি প্রদান করছি। সেই হবি এখন অগ্নি, সূর্য ও প্রজাপতির, আমার নয়। যদিও এই তিনটি শব্দের অর্থ একই কিন্তু এর দ্বারা উৎপন্ন ধ্বনি-কম্পন শরীর, মন ও প্রাণের উপর বিভিন্ন রকম প্রভাব সৃষ্টি করে। অগ্নিহোত্রের

এই মন্ত্রগুলি সূর্য থেকে প্রাপ্ত প্রকাশরূপী কিরণগুলির ধ্বনিময় সারবস্তু। অগ্নিহোত্রের মন্ত্রের ঠিক সময় মত উচ্চারণে আবহাওয়া দূষণমুক্ত হয়। এই সব মন্ত্রগুলির অনুবাদে সেই শুদ্ধিকারক শক্তির উন্মেষ সম্ভব নয়। এই ধ্বনির উচ্চারণে বর্ণ ও ধ্বনির কম্পন আবহাওয়ায় পরিব্যপ্ত হয়। সুতরাং মন্ত্রের অশুদ্ধ উচ্চারণে অভীষ্ট ধ্বনি-কম্পন সৃষ্ট হয় না। পরিণামে বক্তা মন্ত্রের লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

বর্ণ শব্দের দুটি অর্থ— ধ্বনি ও রং। কম্পন দ্বারা শক্তি উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির উৎপত্তি কম্পনরূপে শক্তি দ্বারা হয়েছে-এরকম ধারণা বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানীরা পোষণ করেন। ধ্বনি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, ধ্বনি কম্পনের ভালমন্দ পরিণাম বিজ্ঞানীরা জানেন, যেমন—সঙ্গীত শুনে গাভি বেশি দুধ দেয়, গাছপালার বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। পুলের উপর চলার সময় সৈনিকদেরকে একতালে না চলার আদেশ দেওয়া হয় কেননা তাল বদ্ধ সঞ্চালনে উৎপন্ন কম্পনে পুল ভেঙ্গে পড়ার উদাহরণও আছে। সুমধুর ধ্বনি (নাদ) শরীর ও মনের উপর সুন্দর প্রভাব ফেলে। আজকাল এই ধ্বনি (পরাশ্রব্য) তরঙ্গ সমুদ্রের গভীরতা মাপতে, সংবেদশীল শল্যক্রিয়া এবং ক্যানসারের চিকিৎসায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে। অগ্নিহোত্রের মন্ত্রে ধ্বনি চিকিৎসার (ভাইব্রেশান থেরাপী) গুণ কী রকম নিহিত, তাহা উল্লেখিত বিবেচনায় পরিষ্কার বোঝা যায়।

বর্ণের একটি অর্থ হল— রং। রং চিকিৎসা (ক্রোমোপ্যাথী) আধুনিক চিকিৎসায় একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ভিন্ন ভিন্ন গতি সম্পন্ন তরঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব উৎপন্ন করে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকাশ বা আলোককে তরঙ্গ রূপে স্বীকার করে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলোকের ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন (ফ্রিকোয়েন্সী) হয়। আলোকের রং গাঢ় বা হালকা, সেই রঙের আলোক-তরঙ্গের তীব্রতার (ইনটেনসিটি) উপর নির্ভর করে। মন্ত্রশাস্ত্র মতে দেবনাগরী বর্ণমালা সাদা, লাল, হলুদ ও নীল রঙে বিভক্ত, প্রতিটি রঙের নিজস্ব বিশেষ গুণ-প্রভাব আছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন রঙের চিকিৎসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো কাজ লাগানো হয়। যেমন— লাল রঙের আলো উষ্ণতা প্রদান করে, তাই কিছু চর্ম ও রক্ত পীড়ায় এটা সুফল দিয়েছে। লাল রঙের আলো মানসিক শক্তি যোগায়। সব সময় উদাসীন এবং পরিস্থিতির শিকার নিরাশাবাদীর পক্ষে এটা ভাল কাজ দেয়। চক্ষু অপারেশনের পরে চোখে সবুজ রঙের পট্টী বেঁধে দেওয়া হয়। ধাতু বিল্ডিঙের কাজ করার সময় তা থেকে উদ্ভূত তীব্র আলো থেকে চক্ষু রক্ষা করতে বেগুনী রঙের কাঁচের প্লেট ব্যবহার করা হয়। এইরূপ প্রতিটি রঙের এটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

যজ্ঞদ্বারা আবহাওয়ায় অনুকূল ও পুষ্টিকর তত্ত্ব বিস্তার করার সময় মন্ত্রোচারণ দ্বারা চতুপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে সূক্ষ্ম কম্পন-ধ্বনি প্রসারিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে আহুতিও প্রদান করা হয়। আহুতির দহনে উৎপন্ন অগ্নির লাল-নীল-হলুদ রংয়ের সঙ্গেও যজ্ঞ মন্ত্রের অদ্ভুৎ সামঞ্জস্য আছে। এইভাবে এই মন্ত্র সমূহে যজ্ঞ চিকিৎসার গুণও সন্নিবেশিত রয়েছে। যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় এটা লক্ষ্য রাখতে হয় যে, মন্ত্রগুলি অস্ফুষ্টভাবে বা চিৎকার করে বলা না হয়। প্রতিটি মন্ত্রের বিশিষ্ট স্বর (তীব্রতা ও বারম্বারতা) সহ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। মলাহার রাগিনীতে বর্ষা হওয়া এবং দীপক রাগিনীতে আগুন ধরে যাওয়ার উদাহরণ ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। মন্ত্র সহ স্বর-লয়-মাত্রার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই দিক দিয়ে যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণের সময় আজকাল ব্যবহৃত লাউড স্পীকার, ধ্বনি তরঙ্গের তীব্রতা পরিবর্তন করে দেওয়ার কারণ হিসাবে মন্ত্র ধ্বনির পরিপ্রেক্ষিত উপযুক্ত নয়। যজ্ঞে উচ্চারিত মন্ত্র সদ্ভাবে উৎপন্ন কারী অক্ষর সমূহ; তদনুরূপ তার উচ্চারণ হওয়া উচিত। এরফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে সাহায্য পাওয়া যায়। নিয়ম বিরুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে লাভের বদলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

(ঙ) ভাবনা – একজন চিকিৎসক প্রয়োজন বোধে অস্ত্র দ্বারা কোনো রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করে, একজন ডাকাত অস্ত্র দ্বারা কোনো লোকের অঙ্গহানি করে। ক্রিয়া দুটি সমান হলেও দুটি ব্যক্তির (চিকিৎসক ও ডাকাত) চিন্তাধারা বা ভাবনা পৃথক হওয়ায় ক্রিয়া ফলও ভিন্ন হয়। যজ্ঞে উচ্চ সাত্ত্বিক ভাব থাকা অতি প্রয়োজন। যজ্ঞে স্বার্থ নয়, বরঞ্চ পরমার্থ চিন্তা থাকা দরকার। অগ্নি, সূর্য, প্রজাপতি ইত্যাদিকে আহুতি প্রদান করার পর "ইদন্ন মম" শব্দের উচ্চারণ করা হয়। যাজ্ঞিক বা যজ্ঞকারীর ভাবনা কেমন হবে ? এই তথ্য ইদন্ন মম শব্দের ভাবার্থে নিহিত আছে। যাজ্ঞিক তার অর্থ-দ্রব্য -শ্রম নিযুক্ত করে যজ্ঞ করল। এর ফলে তার মধ্যে অহংকার আসতে পারে। এটা আমার জন্য নয়, এটা আমার জন্য নয় বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অহংভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে। বৈদিক যজ্ঞের এই ভাবনা পরিত্যাগ করার ফলে তান্ত্রিক-যজ্ঞ ও পশুহিংসা যজ্ঞের প্রচলন হয়েছে। এই প্রকার অসদ্ভাবযুক্ত যজ্ঞ অভিষ্ট সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম। অথর্ব বেদে (১২/৫/৫৬) বলা আছে—"যে মনুষ্য বৈদিক নিয়মের অবহেলনা করে অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি কপট মন নিয়ে সম্পাদন করে, তার কোনো সম ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না।"

প্রকৃতিতে সঙ্ঘটিত পরিবর্তনের সঙ্গে মনুষ্য শরীর-সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপের ছন্দ বজার রাখার জন্য আলো ও অন্ধকারের সন্ধিকাল প্রাতঃকাল বা সূর্যোদয় এবং সায়ংকাল বা সূর্যাস্তকালে যজ্ঞ বিশেষ ফলদায়ী হয়। অতএব সকাল

সন্ধ্যা যজ্ঞ করার বিধান আছে। এর ফলে দূষিত আবহাওয়া শুদ্ধ হয়।

৩. প্রাকৃতিক চিকিৎসায় যজ্ঞের প্রয়োগ :

প্রাকৃতিক চিকিৎসার মৌলিক সিদ্ধান্ত হলো এই যে, শরীরের স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক) অবস্থাই সুস্থ অবস্থা। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য মানুষকে মন ও কর্মের দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। বাহ্যিক জীবাণু ইত্যাদির কুফল থেকে রক্ষা করার যথেষ্ট ক্ষমতা শরীরের আছে। কিন্তু মানুষের অনিয়মিত আহার বিহারের ফলে যখন শরীরের প্রতিরোধী পদার্থের (অ্যান্টিবডি) ক্রিয়া মন্দীভূত হয় তখন শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন গরম ঠান্ডা, জীবাণু ইত্যাদি রোগের নিমিত্ত কারণ হিসাবে দেখা দেয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলির দ্বারা শরীরের এই প্রতিরোধী পদার্থকে সক্রিয় করা হয়। বায়ু (প্রাণায়াম), মাটি (প্রলেপ) ও জল (জল চিকিৎসা) ইত্যাদি এর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কঠিন রোগে নিম, গুলঞ্চ আদি শোধন-ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন গ্যাস ও পরিবেশ শরীরকে প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনেকখানি সাহায্য করে। ভারতে যদিও এটি একটি সামান্য ঘটনা কিন্তু বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকায় এটিকে শরীর চিকিৎসার এক পৃথক পদ্ধতি মেনে নিয়ে একে 'হোমোথিরাপি' নাম দেওয়া হয়েছে।

কোষ শুদ্ধি বা শরীর শুদ্ধির জন্য যোগ সাধনার পূর্বে করণীয় আসন মুদ্রাদি প্রাকৃতিক চিকিৎসার অঙ্গ। যোগে ষড় বা অষ্ট চক্রের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। যজ্ঞ দ্বারা এইসব চক্রগুলির উপর অনুকূল প্রভাব পড়ে। আমেরিকার 'সৎসঙ্গ' নামক পত্রিকায় (১২,২ জুন, ১৯৮৪) এই বিষয়ে শী এডওয়ার্ড আইকবোয়েব ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী ইনগ্রিড আইকবোয়েব ইন্দোনেশিয়ার অবস্থিত সোলো (বা সুরাকাতা) ভ্রমণ বিবরণে এই রকম বলেছেন।

সোলো নগরে শ্রী সুযোনী হেনোগডরসোনো নামক একজন দার্শনিক বিদ্বান একসময় কয়েকজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে এমন একজন লোক উপস্থিত ছিলেন যিনি সূক্ষ্ম তাপশক্তি বিশেষভাবে অনুভব করতে পারতেন। 'ব্যাহূতি হোম' নামক এক প্রকার রোগনিবারক অগ্নি আছে যা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পর যে কোনো সময় প্রজ্বলিত করলে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন সম্ভব হয়। তিনি তাম্রপাত্র নির্মিত পিরামিডে এই হোম করলেন। অগ্নি নির্বাপিত হলে উক্ত ব্যক্তি বললেন—"আমি তাম্র পিরামিডের উপর সবুজ রঙেরআলো দেখলাম। পার্থিব তাপশক্তিগুলি মূল চক্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে এবং কন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত

করছে দেখলাম"।

সায়াংকাল যখন সূর্যাস্ত-হোমযজ্ঞ করা হলো তখন সেই ব্যক্তিই অনুভব করলেন, "মন্ত্রোচ্চারণের পরে, আমি পিরামিডের উপর সোনালী হলুদ রঙের আলো দেখলাম এবং তাপশক্তিগুলি কোনো এক চক্রবিশেষকে প্রভাবিত করছিল না বরং সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ধনাত্মক (পজিটিভ) ছিল।"

যৌগিক ক্রিয়াগুলির জন্য অগ্নিহোত্র পরম আবশ্যক কেননা এর ফলে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয় অথচ প্রাণ (জীবনীশক্তি) বায়ুমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল। প্রাণ ও মন একই মুদ্রার দুটো দিক। সবাই এটা সাধারণভাবে অনুভব করেছেন যে, ধ্যানের জন্য মনকে একাগ্র করতে যজ্ঞের পরিবেশ সহায়ক হয়।

চিকাগোতে (ইলিনায়) ১৯৮৫ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত, 'সেভেন কন্টিনেন্ট ডাউসর্স গ্রুপ স্প্রিং কনভেনশনে' (ইউ.এস.সৎসঙ্গ.১৩, ৫ জুলাই, ১৯৮৫) শ্রী হোজিজ বক্তৃতা দেওয়ার সময় বললেন, "আমি প্রথমবার যজ্ঞ করে আশ্চর্যজনক ফল লাভ করলাম। মন এত শান্ত হলো যে, তিন মিনিটেই মন একাগ্র হয়ে ধ্যানাবস্থা এসে গেল অথচ অন্য সময় এক ঘন্টার আগে এরকম অবস্থায় পৌঁছাতে পারিনি"। এটা স্বাভাবিক যে, যজ্ঞ দ্বারা শরীর ও মনের চাপ (টেনশন) দূর হয়। যে কারণে অনেক রোগ নিরাময় হয়। পাশ্চাত্য মত ছাড়া ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়গুলিতে আজকাল জল,বায়ু, মাটি, যৌগিক আসন মুদ্রার সঙ্গে হোমযজ্ঞেরও প্রচলন করা হয়েছে।

আমেরিকার একজন মনোচিকিৎসক শ্রী বেরী রাথনের পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে "মানসিক চাপের উপর হোমযজ্ঞের প্রভাব" নামক বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই ঘরোয়া চিকিৎসায় বাচ্চাদের মৃগী রোগ হ্রাস হতে থাকে এবং মানসিক দিক দিয়ে জড় বুদ্ধি বালকের উন্নতি সম্ভব। শ্রী রাথনের বলেন যে, বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা পৃথিবী এবং গ্রহপুঞ্জের গতির কারণে, উদ্ভূত প্রাকৃতিক তরঙ্গগুলি বায়ুমণ্ডলের উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। মানুষের শরীর ও মস্তিষ্কের উপরও এই তরঙ্গগুলির বিরাট প্রভাব পড়ে।

জীবনবিজ্ঞানের কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতে যজ্ঞধূম শরীরের মধ্যে গেলে শরীরের নার্ভ তন্তু সমূহের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া হয়। যজ্ঞ ধূমের প্রভাবে রক্তের 'সুগারপ্লেট' বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

৪. রোগ জীবাণুদের উপর যজ্ঞের প্রভাব :

বায়ুতে সর্বত্র অসংখ্য রোগ জীবাণু ছড়িয়ে আছে। অনুকূল পরিস্থিতিতে এই রোগ জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর মাত্রা হ্রাস পায়। যজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর অধ্যয়ন ও গবেষণা অনেক গবেষক করেছেন সত্য কিন্তু এখানে কেবল একজনের গবেষণা কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

বোম্বাইর জীবাণু বিজ্ঞানী শ্রী এ.জি.মোন্ডকর বায়ুমণ্ডলীয় জীবাণুদের সংখ্যার ওপর যজ্ঞের প্রভাব জানার জন্য ১৯৮২ সালে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করলেন। একটি পরীক্ষায় সমান আকারের দুটি কামরা নির্বাচিত করা হলো। পরীক্ষার আধ ঘন্টা আগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের মধ্যে এক কামরায় ঠিক সূর্যাস্ত কালে হোমযজ্ঞ করা হলো। দ্বিতীয় কামরাটিতে সেই সব দ্রব্যগুলি পোড়ানো হলো কিন্তু যজ্ঞ হলো না। এইভাবে এই দুই কামরাকে দু ঘন্টার জন্য ব্যবহার করা হলো। তারপর দুটি কামরার রোগ জীবাণু সংখ্যা পুণরায় গণনা করা হলে মোন্ডকর দেখলেন যে, দ্বিতীয় কামরার তুলনায় প্রথম কামরায় রোগ জীবাণুদের সংখ্যা ৯১.৪% হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যজ্ঞ কেবল ধূম্র ক্রিয়া নয় এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু যা তদন্ত সাপেক্ষ।

ডঃ মোন্ডকর অন্য একটি পরীক্ষায় কোনো রোগ জীবাণু বিশেষের উপর হোমযজ্ঞের প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করলেন। এর জন্য তিনি স্ট্যাফিলোকাকাই পয়োজিন্স নামক রোগ জীবাণুকে বেছে নিলেন। এই রোগজীবাণুকে রক্ত পরীক্ষা করার দুটো প্লেটের মধ্যে ঢুকালেন। এর মধ্যে প্রথম প্লেটকে যজ্ঞের বায়ুতে উন্মুক্ত করে বারো ঘন্টা পর্যন্ত ঐভাবে রেখে দেওয়া হলো। পরীক্ষা করে পাওয়া গেল যে, ঐ প্লেটের প্রায় সমস্ত জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে বা মারা গেছে। এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি প্রতিটি প্লেটের জীবাণুদেরকে আলাদা করে এক মিলিলিটার নর্মাল সোডিয়াম ক্লোরাইড তরলে মিশ্রিত করে ঘোল তৈরী করলেন। তাদের গাঢ়ত্ব তুলনা করে তাদের সান্দ্রতা এক সমান করে নেওয়া হলো। এই দুটি তরলকে সমান প্রজাতির এক একটা ইঁদুর নিয়ে তাদের উরুতে টিকা লাগিয়ে পাঁচ দিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা হলো। যজ্ঞ প্রভাবিত প্রথম প্লেট দ্বারা প্রাপ্ত তরলের কোনো প্রভাব ইঁদুরের ওপর পড়ল না অথচ দ্বিতীয় প্রকার তরলের ফলে ইঁদুরের গায়ে এক বিশেষ রকমের ফোঁড়া দেখা গেল। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, যজ্ঞ বায়ুতে রোগ জীবাণু ধ্বংস করার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

অন্য একটি পরীক্ষায় ডঃ মোন্ডকর হবনকুন্ড থেকে বিভিন্ন দূরত্বে (একশ

ষাট সেন্টিমিটার থেকে দুশ পঁচিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত) রাখা বস্তুর উপর যজ্ঞের প্রভাব সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করলেন। এর জন্য তিনি স্টেফ এলবুস, বি সবিটিলিস এন্টেরোকোকাই, ই.কোলাই, স্টেফ পায়ো এবং ডি পেনমো নামক জীবণুদেরকে বেছে নিলেন। তিনি দেখলেন যে, যজ্ঞের বায়ুতে রোগ জীবাণুদের সংখ্যা কমে যায় এবং হবনকুন্ড থেকে যত দূরত্ব বাড়তে থাকে তত যজ্ঞের জীবাণু দমন ক্ষমতা কমতে থাকে (ইউ.এস. সৎসঙ্গ, ১০,৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২)।

এইরকম নিজস্ব পদ্ধতিতে একটা পরীক্ষা করেছিলেন ডঃ বি.আর.গুপ্তা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, জীবাণু বিজ্ঞান বিভাগ, চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুর (উত্তর প্রদেশ)। তিনি দেখলেন যেসব আবাসীয় কলোনীতে যজ্ঞ হয় না সেখানকার বায়ুমণ্ডলে রোগ জীবাণু সংখ্যার হার একশ তেইশ, অথচ যে সব কলোনীতে নিয়মিত যজ্ঞ হয় সেখানকার রোগ জীবাণু সংখ্যার হার মাত্র পঁচিশ। এর দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, যজ্ঞের দ্বারা বায়ুতে রোগ জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অতএব (বায়ু দূষণ দূর করার জন্য যজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন)। অর্থববেদে (১০/৫/৪৩) এইজন্য বলেছে যে, "প্রজাপালক রাজা অত্যাচারীদেরকে বশে রাখুন এবং তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিন যেমন হোমে উত্তম সামগ্রী ও সমিধা দ্বারা রোগবাহক দুর্গন্ধ (রোগ জীবাণু) ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যায়।"

একজন বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক ডঃ বি.ভেঙ্কটরাও তাঁর পঞ্চতন্ত্র নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, "আধুনিক সভ্যতা মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এইজন্য আধুনিক মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আজ আমরা এটাও ভুলে গেছি যে, আমাদেরকে বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যের আলোয় বাঁচতে হবে।"

ঠিক এইরকম প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক চিকিৎসক ডঃ হেনরী লিন্ডলহার তাঁর রচিত 'ফিলসফি অ্যান্ড প্রাকটিস অফ নেচার কিওর' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে স্বাস্থ্য ও রোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন— শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্তরে, মানব নির্মাণকারী তত্ত্ব ও শক্তির স্বাভাবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ স্পন্দনের নাম স্বাস্থ্য। অন্যথা একটি বা দুটি স্তরে সীমিত থাকলে রোগ বলতে হবে। দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যতিরেকে, প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘনই রোগের মূখ্য কারণ। ডঃ লিন্ডলহর রোগ নিরাময় করার জন্য যা নির্দেশ দিয়েছেন তার সারমর্ম হলো মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলতে হবে।

যজ্ঞ করার সময় লোম কূপগুলি খুলে যায় এবং হোমযজ্ঞ দ্বারা উত্থিত বাষ্প

চর্মে প্রবিষ্ট হয়ে শরীরকে নীরোগ করে।

যজ্ঞ ভস্ম শরীরে মর্দন করলে ত্বক কোমল ও উজ্জ্বল হয়। যজ্ঞ চিকিৎসায় সংলগ্ন হলে রোগী কোনো চিকিৎসকের উপর নির্ভর না থেকে নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে থাকে।

অতএব প্রাকৃতিক চিকিৎসায় যজ্ঞের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যজ্ঞ ছাড়া প্রাকৃতিক চিকিৎসা অপূর্ণ। এই কারণে হোমোথেরাপি আজ প্রাকৃতিক চিকিৎসার একটি ভিন্ন স্বতন্ত্র চিকিৎসা বলে অভিহিত হয়েছে।

৫ .ভেষজ বিজ্ঞানে যজ্ঞের ব্যবহার :

পাশ্চাত্য ভেষজ বিজ্ঞান গত অর্ধশতাব্দীতে যে উল্লেখনীয় উন্নতি ও প্রগতি লাভ করেছে তাতে মোহান্ধ হয়ে কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা এইরকম অহঙ্কারসূচক উক্তি করে থাকেন—"আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানের সাহায্যে সব কিছু করা সম্ভব"। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, আজকের বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তার সৃষ্ট অনেক সমস্যার সমাধান করতে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান অপারগ। যেমন— এলোপ্যাথিক ওষুধের সাইড ইফেক্টস্ বা অফটার ইফেকট্‌স (পার্শ্ব প্রভাব ও পরবর্তী প্রভাব) ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধগুলির প্রতি মানব শরীরের প্রতিরোধ, ওষুধগুলির অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং আবহাওয়া দূষণের অভিশাপ ইত্যাদি। এইসব সমস্যার সমাধান হেতু পাশ্চাত্য জগতের ভেষজ বিজ্ঞানীরা "মেডিসিনা অল্টারনেটিয়া (বিকল্প ওষুধ) নাম নিয়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।" খুশীর কথা যে, এই সংঘগুলির কিছু ভারতীয় ও বিদেশী মহৎ লোকেরা যজ্ঞের সর্বাঙ্গীন উপকারিতার দিকে ইঙ্গিত করে সেটিকে ব্যবহারযোগ্য করার উপর জোর দিয়েছেন। আবহাওয়া দূষণ ইত্যাদি সমস্যা সমাধান হেতু জেনেভায় জুন ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আধিকারিকগণ, বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা সাংবাদিক, অধ্যাপক, সংস্থার পরিচালক, বিভিন্ন সমন্বয় সাধনকারীগণ, বাচাই করা বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সভার রিপোর্ট একটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল "হোমো-থেরাপি"। এর লেখক হলেন যজ্ঞের বিশ্বব্যাপী প্রচারক ভারতসন্ত শ্রী বসন্ত ভি.পরাঞ্জপে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তরষ্ট্রীয় যুবা-বর্ষ ১৯৮৫ সালে জেনেভা সম্মেলনের উপলক্ষ্যে 'টি প্রজেক্টর' অংশ হিসাবে এটা প্রকাশিত হয়েছিল।

মুম্বাইর জীবাণু বিশেষজ্ঞ ডঃ এ.জি.মোন্ডকর যজ্ঞের পরে যজ্ঞকুন্ডে রক্ষিত শীতল ভস্ম রোগনাশক হিসাবে তার প্রভাব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করলেন। খরগোশদের মধ্যে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি—চুলাকানি সারানোর জন্য সাধারণত বেঞ্জাইল বেঞ্জোয়েট বা স্যালিসিলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয় তাতে এই রোগ সারতে ছয় থেকে আট দিন পর্যন্ত লেগে যায়। ডঃ মোন্ডকর সেইসব চুলকানি রোগযুক্ত খরগোশকে যজ্ঞভস্মের সঙ্গে গোঘৃত মিলিয়ে মলম বানালেন। সেই মলম লাগিয়ে দেখলেন যে, মাত্র তিন দিনে খরগোশগুলো রোগমুক্ত হয়ে গেল (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ৯,১২,১৯৮২)। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যজ্ঞ কেবল বায়ুমণ্ডলের জীবাণুদেরকে নষ্ট করে না বরং শ্বাসসহ রক্তে মিশ্রিত হয়ে শরীরকে সুস্থ করে তোলে। উপরন্তু এর ভস্মেও বীজবারক (এন্টিসেপ্টিক) গুণ থাকায় এর মধ্যে রোগনাশক শক্তি আছে যার দ্বারা ক্ষত ইত্যাদি নিরাময় করা যেতে পারে।

৬. মানসিক ব্যাপারে যজ্ঞের প্রভাব :

পার্থিবতা প্রধান আধুনিক জীবন মানব মস্তিষ্কে অনেক প্রকার জটিল জটের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে জীবনের গুরুত্বই শেষ হয়ে গেছে। এই প্রকার মানসিক চাপের ওপর যজ্ঞের যথার্থ প্রভাব অনুসন্ধান করার জন্য দিল্লীর "ডিফেন্স ইন্স্টিটিউট্ অফ ফিজিওলজি অ্যান্ড অ্যালাইড সাইন্সেজ"-র বিজ্ঞানী ডঃ ডবলু সেলভামুর্ত্তি একটি অসাধারণ পরীক্ষা করেছিলেন। এটিকে একটা গবেষণা পত্র হিসাবে ভারতীয় শিল্পসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান(আই.আই.টি) দিল্লীতে ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯ সনে আয়োজিত 'যোগ সম্মেলনে' উপস্থাপনা করেছিলেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম ছিল 'মন ও শরীরের সুস্থতার উপর মন্ত্রের প্রভাব'। ডঃ সেলভামূর্ত্তি এই পরীক্ষাকালে ই.সি.জি.ই.ই.জি,অক্ষর শ্রেণি বিশ্লেষণ এবং আধুনিক কম্পিউটার ইত্যাদি উন্নত মানের সরঞ্জাম ও যন্ত্রবিদ্যা কাজে লাগিয়েছিলেন। আটটি লোকের উপর পরীক্ষা করে তিনি জানতে পারলেন যে,যজ্ঞ চলাকালীন হৃদয় স্পন্দন সংখ্যা হ্রাস পায়,ত্বকের তাপমাত্রায় এক ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি।তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যজ্ঞের বায়ুতে মস্তিষ্কের উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতার উপশম হয়, মানসিক চাপ কম থাকে এবং মন মস্তিষ্ক তার স্বাভাবিক কাজ করার শক্তি ফিরে পায়।

৭.যজ্ঞভস্মের রোগনাশক ক্ষমতা :

ডি.আই.পি.এ.এস. নিউ দিল্লীর উয়িং কমান্ডার ডঃ ভি.কে.রাও (ক্লাসিফাইড স্পেশালিস্ট, প্যাথোলজি) এবং কর্ণেল আর.এস.তেওয়ারি (সিনিয়ার অ্যাডভাইজার, মেডিসিন) যজ্ঞ ভস্মের রোগনাশক ক্ষমতা এবং ক্ষত নিরাময় করার গুণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য সাদা ইঁদুরের (এলবিনোমডিস) উপর পরীক্ষা করলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো যে, যজ্ঞভস্মে অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ বিদ্যমান। যেসব রোগজীবাণু সাধারণত সংক্রমণ (ইনফেকশন) ঘটায় যেমন— সিউডোমোনাস, প্রোটিয়াস, ই.কোলাই, ক্লেভিসিলা, স্টেফিলোকোকস ইত্যাদি, তাদের উপর যজ্ঞভস্ম মারণ প্রভাব সৃষ্টি করে। তাছাড়া এই ভস্ম দ্বারা যে ক্ষত পূর্ত্তি হয় তার চিহ্নও খুব অল্পই থাকে (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১৫, ৩, জুন ১৯৮৭)।

৮. হোম চিকিৎসা :

পশ্চিম জার্মানের মোনিকাজেহলে নামক একজন ভেষজ রসায়নবিদ্ পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করেছেন যে, অনেক রোগ যজ্ঞ ও যজ্ঞভস্ম দ্বারা নিরাময় করা যেতে পারে। তিনি এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে 'হোম চিকিৎসা' (হোমোথেরাপি) নাম দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা কৃত গবেষণা 'ইউ.এস.সৎসঙ্গ (১১,৭) নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ সনে (১২/১৮-১৯) এর পূনর্মুদ্রন হয়। যে সবের সারাংশ নিম্নে দেওয়া হলো—

রোগের নাম	পরীক্ষা ও ফল
ফ্রন্টল সাইনুসিটিস –	নিয়মিত যজ্ঞ দ্বারা শির পীড়ার সমাপ্তি, তিন চারদিনে পূঁয শিথিল হলো।
স্কিন ফাংগাস –	যজ্ঞভস্ম নিয়মিত প্রতিদিন কয়েকবার লাগালে রোগমুক্তি।
নন-হীলিং উন্ড	যজ্ঞভস্ম লাগালে তিনদিনে রোগের সম্পূর্ণ নিরাময়।

হয়িটলো — ত্বকে যজ্ঞভস্ম লাগালে চার দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য, রোগীর কোনো কষ্ট হলো না।

রজঃস্রাবের বৃদ্ধি — যজ্ঞভস্ম মধুসহ প্রতিদিন দুইবার খেয়ে আট সপ্তাহে স্রাব স্বাভাবিক হলো, মাথা ব্যাথা ও অন্য ব্যাথাও গেল।

কিডনির পীড়া — যজ্ঞভস্ম অল্প পরিমাণে প্রতিদিন দুই/তিন বার খাওয়ায় একসপ্তাহে রোগের উপশম।

গ্যাসট্রিটিস — যজ্ঞভস্ম তিনবার প্রতিদিন খাওয়ায় বিজাতীয় দ্রব্য কফ হয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় রোগমুক্তি।

মৃগী — অল্প পরিমাণ যজ্ঞভস্ম প্রতিদিন দুইবার খাওয়ায় ফিট দুটির মধ্যকার সময় বাড়তে থাকল, সব সময় ক্লান্তিভাব দূর হলো।

টনসিলাইটিস — চা চামচের আধ চামচ যজ্ঞভস্ম প্রতিদিন দুইবার খাওয়ায় জ্বর ছাড়া টনসিলও স্বাভাবিক হলো।

উল্লেখিত গবেষণা মোনকাজেহলের ভেষজ রাসায়নবিদ্, কোলিনস্ট্রাসে ১৩,৭৭৬০ রোড ফ জেল্ল/ বোডেসী, ওয়েস্ট জার্মান, অভিজ্ঞতার উপর আধারিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা দৈনিক যজ্ঞের অসাধারণ সুফল অর্জন করেছেন। নিম্ন বাক্যে সেগুলির উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপ্তিকে সীমিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

যজ্ঞভস্মের ক্ষতপূরণ করার ক্ষমতা নিম্নলোকেরা পরীক্ষা করে দেখছেন—

গ্ল্যাডিজ ম্যাভিনা — চিলি, দক্ষিণ আমেরিকা (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১/২ ফ্রেবুঃ ১৯৮৫)

এলস্‌বিটা গেরলেকা — গডান্সক, পোলান্ড (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১৩/১০ অক্টো- ১৯৮৫)

থেল্‌মা বিল্টানো - কিউলপিউ, চিলি (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ২৪/২৪ মে, ১৯৮৭)

রোগী - ভারতীয় সৎসঙ্গ ১/১, ১৯৮০

জন টেলর জ্যাক্‌সন - ইউ.এস.এ (ভারতীয় সৎসঙ্গ ১/১, ১৯৮০)

ইনগ্রিস হোবার্ড - ক্যানাডা (ভারতীয় সৎসঙ্গ ৩/১, ১৯৮০)

ক্রিস্টিয়ানা ওজরোস্কা - ওয়ার্ধা, পোলান্ড (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১২/১৬, জানু ১৯৮৫)

পাঁচড়া (স্ক্যাবিজ), পায়ের ঘা, চামড়ায় ফুসকুড়ি, র‍্যাশ ও আঁচিল থেকে অব্যাহিত পাওয়ার জন্য যজ্ঞ ও যজ্ঞভস্ম দিয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সার্থক পরীক্ষা করেছেন—

ইনগ্রিড হোবার্ড - ক্যানাডা (ভারতীয় সৎসঙ্গ ১/৩, ১৯৮০)

ক্রিস্টিয়ানা ওজরোস্কা - ওয়ার্সা, পোলান্ড (ভারতীয় সৎসঙ্গ ৫/৮, ১৯৮৪)

গ্ল্যাডিজ ম্যাডিনা - চৌকীগুয়াস ভ্যালি, চিলি (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১/১৮, ফ্রেবুঃ ১৯৮৫)

ডঃ পুষ্পা জোশী - লুনাবলা, ভারত (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১২, ১৯৮৫)

লিসা পাওয়ার্স - ইউ.এস.ও (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ৯ জুন, ১৯৮১)

ক্রুপ ও হাঁপানি ইত্যাদি শ্বাসরোগ থেকে নিম্নব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করেছেন—

রবার্ট বোগোটা - কোলম্বিয়া, ইউ.এস.এ (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১০ মে, ১৯৮২)

শ্রীমতী আর.ডি.ওয়ার্সা - ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১২ জানুঃ ১৯৮৫

জে.ডবলু.ওয়ার্সা

এস.বি.ওয়ার্সাও

বি.পি.জিন্দল – আম্বালা ক্যান্ট (ব্যক্তিগত প্রেরণ)

এস.চৌধুরী – নিউ দিল্লী, ভারত (ব্যক্তিগত প্রেরণ অক্টোঃ ১৯৮৬)

এলসবিটা গেরলেকা – ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১৩/১০ অক্টোঃ ১৯৮৫

ফনসায়র (ইউ.এস.এ) ১৯৮৫ সনে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির শিশুদের আচরণ যজ্ঞের পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলো– এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

জার্মান বিজ্ঞানীরা গরুর উপর এ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। যজ্ঞভস্মের মলম ও ক্রীম লাগিয়ে হার্পিজের মত রোগের উপশম হলো। একটি গাভির পায়ে অনেকদিন ধরে ফোলা ও ব্যাথার অভিযোগ পাওয়া গেল। হোম চিকিৎসায় তিন দিনে গাভিটি সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। গরুর স্তনের ফোলাও যজ্ঞ মলম লাগিয়ে কমে গেল।

ভারত ও আয়ারল্যান্ডে যজ্ঞ দ্বারা ইঁদুরের প্রকোপ সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। পশুদের গায়ে আঁটুলি ও পোকা এর ব্যবহারে ছেড়ে চলে যায়।

গরুর পাতলা পায়খানায় জার্মানীতে মাত্র একটা দিন গরুর খাদ্যে যজ্ঞভস্ম মিশাতেই সেটি স্বাভাবিক দুধ দিতে লাগল।

গোশালায় যজ্ঞ করলে গাভিরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। একমাস পর্যন্ত এই পরীক্ষা করে গাভির দুধ ও মাখনের মাত্রায় বৃদ্ধি হয়েছে জানা গেল।

'নবনীত' পত্রিকায় (বোম্বাই) বিজ্ঞান-বার্তা কলামে 'অন্বেষী' দ্বারা সঙ্কলিত অগ্নিহোত্র বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা দ্বারা যজ্ঞের পরীক্ষা নিরীক্ষার সার পেশ করার সময় লিখছে যে, যজ্ঞের ধোঁয়া প্রয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আমেরিকায় ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর 'আলুভিনি' নামক পোকাকে সমূলে ধ্বংস করতে সফল হয়েছেন। এইসব বিজ্ঞানীদের মতানুসারে যজ্ঞধূপ আট কিলোমিটার পর্যন্ত বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত হয় এবং সেখানকার আবহাওয়া দূষণমুক্ত হয়ে সেই এলাকায় ফসলের উন্নতি হয়। যজ্ঞের মাধ্যমে ফসলকে রোগ থেকে বাঁচতে এবং ফসলকে চতুর্গুণ করতে আমেরিকার কয়েকজন কৃষক সাফল্য অর্জন করেছেন।

মানসিক দিক দিয়ে অনুন্নত বালকদেরকে নিয়ে ডঃ পঁচেগাঁওকর ও ডঃ বেরী

রাথন মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থিত অম্বেজোগাই নামক নগরে যজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আশাজনক লাভ করেছেন। যজ্ঞ দ্বারা বালকদের অস্বাভাবিক ক্ষুধাও স্বাভাবিক হয়েযায়।

এল্‌সবিটা গেরলেকা (পোল্যান্ড) যজ্ঞ করে সোরিয়াসিস (এমন চর্মরোগ যাতে চামড়ায় লালা চামড়ার মত দাগ হয়ে যায়) রোগ থেকে মুক্তিলাভ করলেন। ইউ.এস.সংসঙ্গ, ১৩/২০ অক্টোবর ১৯৮৫)।

পশ্চিম জার্মানের গবেষণাগারীরা বলেন যে, যজ্ঞের ধোঁয়া (গ্যাস) ও হবন সামগ্রী থেকে সর্দ্দি, মাথা ব্যাথা, চর্মরোগ, পুরানো জ্বর, অতিসার, দাদ, টনসিল ও সন্ধি বেদনী ইত্যাদি অনেক রোগ আরোগ্য হয়।

ইংরাজী 'মিরর' নামক মাসিক পত্রিকার জুলাই ১৯৮৩ সংখ্যার ৭৫ পৃষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল— প্রকৃতির কর্মপ্রক্রিয়ার উপরেও হোমযজ্ঞের প্রভাব পড়ে এবং সেগুলির রূপ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে এখনও বৈজ্ঞানিক তদন্তের প্রয়োজন আছে।

যজ্ঞ সম্বন্ধে পৃথিবীর কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিদের মত এখানে দেওয়া হলো—

"প্রজ্জ্বলিত চিনির ধোঁয়ায় বায়ুশোধন করার বিরাট শক্তি আছে। এর দ্বারা বিসূচিকা, ক্ষয় ও বসন্ত ইত্যাদি রোগের বিষক্রিয়া শীঘ্রই নিবারিত হয়"।— প্রফেসার ট্রিলবার্ট (ফ্রান্স)।

"মোনাক্কা, কিসমিস ও ছোহারা ইত্যাদি শুষ্ক ফলগুলিকে পুড়িয়ে আমরা দেখেছি। আমরা জানতে পেরেছি যে, এ সবের ধোঁয়া দ্বারা মেয়াদি জ্বরেরঅণু-জীবাণু আধ ঘন্টায় এবং অন্য রোগের জীবাণু দুই ঘন্টায় মারা যায়"।—ডঃ এম. ট্রেলট।

"ঘি ও চালে কেশর মিশিয়ে পোড়ালে রোগের সূক্ষ্ম কীট ধ্বংস হয়"।— ডঃ কর্ণেল কিং, সেক্রেটারী কমিশনার (তামিলনাড়ু)।

"এটা ঠিক যে, আর্যদের দ্বারা যজ্ঞের ফলে মেঘ হতো এবং তার থেকে বর্ষা হতো"।— হিন্দুস্থান টাইমস্, ৮ই আগষ্ট, ১৯৫২।

একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর বক্তব্য— প্লেগের টীকার আবিষ্কারক ডঃ হ্যাফকিন (ফ্রান্স) লিখেছেন যে, আগুনে গো ঘৃতের হোম করলে রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়।

৯. কু অভ্যাস দূর করতে যজ্ঞের ভূমিকা :

দূষণের একটা ভয়াবহ রূপ হলো চিন্তন দূষণ। এর ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি এতখানি দূষিত হয়ে পড়ে যে সে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বুঝতে পারে না। সে মাদক দ্রব্যের সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, অর্থ-ব্যবস্থা, পরিবার ও সমাজের পক্ষে এইসব কু-অভ্যাসগুলি ক্ষতিকরই শুধু নয় সর্বনাশ কারক হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করতে পারে না। ব্যক্তির আত্ম সম্মান, মনোবল, নির্ণায়ক শক্তি সব শেষ হয়ে যায়। এর ফলে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য জগতে যে সব কার্যপদ্ধতি এর জন্য গ্রহণ করা হয় সেগুলি ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফলপ্রসূ হয়নি। এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে আমাদের প্রাচীন মনীষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত যজ্ঞই একমাত্র শেষ উপায় প্রতিপন্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার সাইকিয়াট্রি বিভাগে সিনিয়র অ্যাডভাইজার পদে কর্মরত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জি.আর.গুলেচা দ্বারা সংঘটিত পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলির মধ্যে দুই একটির এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে তাহলে যজ্ঞের প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে।

কোলকাতায় ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত "ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির" ৩৯ তম বার্ষিক সম্মেলনে শ্রী গুলেচা তাঁর গবেষণা পত্র "অগ্নিহোত্র অ্যান ইউজফুল অ্যাডজাংক্ট ইন ট্রিটমেন্ট অফ এ রেজিস্ট্যান্ট অ্যান্ড ডিসোটিভেটিভ স্ম্যাক এডিক্ট" পড়েছিলেন যা পরে 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি'-র ১৯৮৭ সনের ২৯(৩) সংখ্যার পৃষ্ঠা ২৪৭-২৫২ তে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই গবেষণা পত্রের কেবল সারাংশ টুকু এখানে তুলে দেওয়া হলো—

স্ম্যাক থেকে মুক্তি—

ভারতীয় সেনার একজন পঁচিশ বছরের অফিসারকে এই পরীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হলো। এই লোকটি গত কয়েক বছর ধরে মদ, কোকেন, ক্যানবিস ও সিগারেট ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন করেছিলেন। পরীক্ষাকালীন তিনি প্রতিদিন তিন গ্রাম হীরোইন (স্ম্যাক) সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন। এই বদনেশা ছাড়ানোর জন্য অন্যান্য পদ্ধতি তাঁর উপর দুইবার প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁকে এই অভ্যাস থেকে মুক্ত করতে পারিনি।

তাঁর এই বদ অভ্যাসটি যজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করার জন্য তাঁকে যজ্ঞের সামনে বসতে অনুপ্রাণিত করা হলো। অনিচ্ছাপূর্বক আনমনাভাবে তিনদিন যজ্ঞের সামনে বসার পর তাঁর যজ্ঞ অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো। অন্যেক দ্বারা আনীত

হওয়ার পরিবর্তে তিনি স্বয়ং যজ্ঞে বসার জন্য চলে এলেন। সপ্তমদিনে তাঁর অবস্থার এত পরিবর্তন হলো যে, তিনি নিজে আহুতি দিতে শুরু করলেন।

তাঁর স্বভাব পরিবর্তনের একটি দৈনিক চার্ট তৈরি করা হয়েছিল। চার সপ্তাহের যজ্ঞের ফলে স্ম্যাকের জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ আর রইল না। আগামী পনের মাসে নিয়মিত যজ্ঞ করার অভ্যাসের দরুন তাঁর সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের প্রতি ঘৃণা হয়ে গেল এবং তিনি নেশা থেকে মুক্ত হলেন। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিদ্যমান নভমন্ডলের কিরণ এবং যজ্ঞ থেকে উদ্ভূত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সমলয়ভাবের কারণে সঞ্জাত মনের শান্তিই এর রহস্য। যদিও বর্তমানকালে বিজ্ঞান জগতের কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে কিন্তু তথ্যসমূহ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

মদ থেকে মুক্তি—

মনোবিজ্ঞানী শ্রী গুলেচা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটা পরীক্ষা করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির ধারণা যে, মদসেবন কম করা যেতে পারে কিন্তু এই অভ্যাসটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায় না। শ্রী গুলেচার নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। শ্রী গুলেচার এই পরীক্ষাটি 'অগ্নিহোত্র-ইন্ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যালকোহিলজম্ নামক গবেষণা পত্র রূপে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের' ৪১ তম বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এই গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

আঠারো জন মদ্যপায়ীর উপর যজ্ঞের পরীক্ষা করা হলো। কম্পিউটার দ্বারা ই.ই.জির বিশ্লেষণ করা হলো। দুই সপ্তাহ নিয়মিত যজ্ঞ করায় তাদের মদ্যপানের ইচ্ছা লোপ পেল। যজ্ঞ করা ত্যাগ করলেও কয়েক সপ্তাহ পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তারপরে তাদের মধ্যে মদ্যপানের ইচ্ছা আবার বলবতী হয়ে উঠল। দুই সপ্তাহের যজ্ঞের অভ্যাস তাদের বদ অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে দূর হলো না। অতএব মদ্যপানের বদ অভ্যাস সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ পাওয়ার জন্য নিয়মিত রূপে প্রতিদিন যজ্ঞ করতে হবে। মদ্যপানের বদ অভ্যাস ছাড়ানোর জন্য যজ্ঞের গুরুত্ব অপরিসীম।

উল্লেখিত পরীক্ষা নিরীক্ষা বিবেচনা করে আমরা পাই যে, যজ্ঞ করলে মনের সদবৃত্তি গুলির বিকাশ হয়। যে মানুষ মদ, গাঁজা, ভাঙ, আফিং, স্ম্যাক ইত্যাদি মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ে তাকে এই দ্রব্যাদি থেকে বিমুখ করে দেয়। সুতরাং কু অভ্যাস নিবারণে যজ্ঞ একটি মোক্ষম অস্ত্র।

১০. বীজের অঙ্কুর উৎপাদনে যজ্ঞের কার্যকরতা:

পুণের এম.জি.পি. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বি.জি.ভুজবল দ্রাক্ষাবীজ ও বৃক্ষের কলমের অঙ্কুরণের উপর যজ্ঞবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, অনেকগুলি হরমোন প্রয়োগ, বল্কল ছেদন (স্কারিফিকেশন) এবং স্তর বিন্যাসকরণ (স্ট্র্যাটিফিকেশন) ইত্যাদি সদৃশ আধুনিক টেকনোলজি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আঙুরের কুঁড়ির অঙ্কুরণ খুব কম হয়। এর একশটি বীজের মধ্যে মাত্র কুড়িটি বীজ অঙ্কুরিত হয় তাও অনেক সময় পরে— তিনশ দিন পরে। এই ত্রুটিকে মনে রেখে 'অনব এ শাহী', 'পন্ধরী শাহী', 'কলী শাহী' কিছু সঙ্কর বীজের সঙ্গে স্থানীয় আঙুরের সঙ্করণ হেতু স্থানীয় থম্পসন প্রজাতিকে গ্যারেন্টি হিসাবে নিযুক্ত করে একটা পরীক্ষা করা হলো। সব বীজ ও কলমকে যজ্ঞের বায়ুতে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হলো এবং যজ্ঞ ভস্মও মাখানো হলো। কয়েকটি বীজ ও কলমকে কোনো ব্যবস্থা ছাড়া তুলনা করার জন্য (কন্ট্রোল স্যাম্পেল) আলাদা করে রাখা হলো।

ডঃ ভুজবল যারপরনাই বিস্মিত হলেন যখন তিনি দেখলেন যে, বীজ বপনের মাত্র একুশ দিন পরেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গেল অথচ যজ্ঞব্যবস্থাহীন বীজগুলি ছয়মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় নিল। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞবায়ু বীজকে শীঘ্র অঙ্কুরিত হতে উৎপ্রেরিত করে। কলমের শিকড় বের হবার হার শত প্রতিশত ছিল। ফসল ক্ষতি কিছুই ছিল না। ফসলে কোনো পোকা লাগেনি, আঙুরের রং উত্তম অর্থাৎ সোনালী হলুদ ছিল এবং টি.এস.এস ২৪% কোয়ালিটি ছিল। অথচ অন্যবেলায় ফসলক্ষতি ত্রিশ প্রতিশত এবং আঙুরের রস হলদে সবুজ ছিল।

ডঃ ভুজবল বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন যখন তিনি দেখলেন যে, যজ্ঞবায়ু আঙুর থেকে মোনাক্কা হতে সাহায্য করে। যজ্ঞবায়ুতে আঙুর গুচ্ছের শুষ্ক হওয়ার প্রক্রিয়া মাত্র একুশ দিনে সম্পন্ন হলো এবং পঁয়ত্রিশ দিনে তার স্বাদও খুব ভাল হয়ে গেল (ভারতীয় সৎসঙ্গ ১/১০, মার্চ ১৯৮১)।

পিপলগ্রামের একটা ফার্মে হোম করার ফলে বীজ বিয়াল্লিশ দিনের বদলে বাইশ দিনে অঙ্কুরিত হয়ে গেল।

উল্লেখিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যজ্ঞবায়ু ও যজ্ঞ ভস্ম বীজের অঙ্কুরণে অত্যন্ত সহায়ক।

১১. পূর্ণ শস্য উৎপাদনে যজ্ঞের কার্যকারিতা:

মনুষ্যজাতি প্রতি বছর পোনে চারশ অর্বুদ টন সামগ্রী খায়। এর বৃহৎ অংশ উদ্ভিদ জগৎ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত হয়। বায়ু ও ভূমি থেকে প্রাপ্ত পদার্থ এবং সূর্যের আলোর সাহায্যে উদ্ভিদরা খাদ্য প্রস্তুত করে। অবশিষ্ট খাদ্য পশুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় এবং যারা উদ্ভিদ জগৎ খেয়েই বেঁচে থাকে।

মানবসৃষ্ট দূষণের অত্যাচারের পরিণাম প্রকৃতির ভয়ংকর প্রকোপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ভূমি, জল, বায়ু ও সূর্যের আলো থেকে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে উদ্ভিদরা আহার তৈরি করে। কিন্তু দূষণের ফলে উক্ত চারটি পদার্থ নিঃসার হয়ে গেছে। উদ্ভিদ জগৎ এখন সেগুলি থেকে পুষ্টিকর পদার্থ পাচ্ছে না। অতএব সমস্যা কেবল বেশি অন্নোৎপাদন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরঞ্চ এরকমও চিন্তা করা হচ্ছে যে অন্নোৎপাদন যাই হোক তা যেন পুষ্টিকর পদার্থে পরিপূর্ণ, গুণমুক্ত ও বিশুদ্ধ হয়।

১২. ফসলের উপর যজ্ঞের প্রভাব :

চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কানপুর, উঃ প্রদেশ) জেনেটিকস্ (প্রজনন শাস্ত্র) বিভাগের ডঃ রামাশ্রয় মিশ্র বরুণ প্রজাতির সরিষা বীজের উপর যজ্ঞভস্মের প্রভাব সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন করেছেন। বপনের পূর্বে সরিষা বীজগুলিকে গরুর গোবর, গো মূত্র ও যজ্ঞভস্মের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা ধরে রাখা হলো। একই পরিমাণের অন্য বীজগুলিকে আলাদা রাখা হলো।

সম্পূর্ণ পরীক্ষাটিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) প্রক্রিয়াভূত বীজ ও ফসলের উপর প্রতি পনের দিন পর যজ্ঞভস্ম ছিটানো। (খ) প্রক্রিয়াভূত বীজ ও ফসলের উপর যজ্ঞভস্ম না ছিটানো। (গ) প্রক্রিয়াহীন বীজ ও ফসলের উপর যজ্ঞভস্ম ছিটিয়ে দেওয়া। (ঘ) প্রক্রিয়াহীন বীজ ও ফসলের উপর যজ্ঞভস্ম না ছিটানো। পরীক্ষাটিকে সাধারণভাবে ছয়টি কৃষিক্ষেত্রে ছয়বার করা হলো।

ডঃ মিশ্র দেখলেন যে, প্রক্রিয়াভূত বীজ এবং যজ্ঞভস্ম ছিটিয়ে দেওয়া জমিতে ফসলের সর্বাধিক বৃদ্ধি অর্থাৎ ত্রিশ প্রতিশত বৃদ্ধি হলো। বৈদিক সংশোধন মন্ডল-পুনার ১৯৮২ সালের পত্রিকায় শ্রী.এম.এস.পারখী বৈদিক সলিউশন ফর প্রেজেন্ট ডে প্রব্লেমস নামক গবেষণা পত্রে এরকম উল্লেখ করেছেন।

ডঃ মিশ্র বীজের অঙ্কুরণ প্রতি গাছ হিসাবে ফলন এবং কীট নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির

উপরেও অনেক গবেষণা করেছেন। গম উৎপাদন তাঁর অভিজ্ঞতা হলো যে, গতানুগতিক নিয়মের তুলনায় যজ্ঞ কৃষি দ্বারা ফসল বেশি উৎপন্ন হয়।

এই গবেষণাটি চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি ও উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্টুডেন্ট ইন্সট্রাকশনাল ফার্মের' উপর সম্পাদন করা হয়েছিল। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্ন টেবিলে দেওয়া হলো।

গবেষণালব্ধ তথ্য

কৃষির প্রকার	প্রতিশত অঙ্কুরণ	ফসল পাকতে সময় (দিন)	শস্য গাছের উচ্চতা (সেমি)	শস্য গাছ প্রতি মাটির উপরের শিকড়ের সংখ্যা	গাছ প্রতি উৎপাদন (গ্রাম)
যজ্ঞ কৃষি	৯৫	১৩২	৬৫.৭৫	৬	৭.৪০
গতানুগতিক	৮০	১৩৫	৫১.৬৭	৫	৬.৩৮
রেগুলেটার	৮০	১২৫	৬৯.৯০	৪	৫.৪৭

উক্ত টেবিলের তথ্যগুলি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, গতানুগতিক নিয়মমাফিক কৃষির তুলনায় যজ্ঞ কৃষি দ্বারা বীজের অঙ্কুরণ ভাল হয়, বেশি শিকড় হয়, গাছের উচ্চতা বেশি হয় এবং ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ অধিক হয়(ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১৫/৪-৫, জুলাই ১৯৮৭)।

১৩. ফসলের সংরক্ষণে যজ্ঞের উপযোগিতা :

যজ্ঞভস্ম ফসল ও শস্যদানা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত সুলভ ও সস্তা জিনিস শস্য দানায় কোনো প্রকার দুর্গন্ধও উৎপন্ন করে না। এম.জে.পি. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পুনে) ডঃ বি.জে. ভুজবল ১৯৮০-৮১ সনে নিম্ন পরীক্ষা করেছিলেন—

নিম্নবর্ণিত শস্যগুলির প্রতিটি প্রকারের এক কিলোগ্রাম দানা বেছে নেওয়া হলো।

গম- জোয়ার এম ৩৫-১, পার্ল মিলেট (মোটা শস্য), মুগ স্থানীয় ফেজিওলস ওরিওস ভ্যারাইটি, ছোলা ও ধান। এগুলি চার ভাগে ভাগ করা হল—

(ক) রেগুলেটার

(খ) এক প্রতিশত যজ্ঞভস্মের ব্যবহার

(গ) দশ প্রতিশত সান্দ্রতাযুক্ত (Concentrated) বি.এইচ.সি. পাউডারের

প্রতিশত ব্যবহার।

(ঘ) সাধারণ ভস্মের ব্যবহার।

নব্বই দিনের পর অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, উল্লেখিত শ্রেণিগুলির মধ্যে কেবল যজ্ঞভস্ম ব্যবহৃত শস্যদানা এবং এক প্রতিশত বি.এইচ.সি ব্যবহৃত শস্যদানাগুলি পোকার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। গুণগত মান বিচারে বি.এইচ.সি ব্যবহৃত শস্যদানা বিরক্তিকর দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় বাজারে গ্রাহকেরা পছন্দ করেনি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যজ্ঞভস্ম শস্যদানা সংরক্ষণ হেতু প্রযোজ্য হতে পারে (ইউ.এ সৎসঙ্গ, ৯/৭ জুন, ১৯৮২)।

বাল্টি মোরের (ইউ.এস.এ) শ্রী আর্লেনা ডেভিস দেখলেন যে, জিপসি মথের আক্রমণের ফলে মেরীল্যান্ডের (ইউ.এস.এ) সেসিলকান্ট্রি নামক স্থানের অরণ্যকে যখন অন্য কোনো রাসায়নিক তরল ছিটিয়ে রক্ষা করা যাচ্ছিল না তখন যজ্ঞভস্ম ছিটিয়ে সেই পোকা থেকে অরণ্যকে রক্ষা করতে সাফল্য পাওয়া গেল।

শামুকের উপর নিয়ন্ত্রণ–

আয়ারল্যান্ড এক অনুর্বর জমিকে উর্বর করার জন্য শামুকের ব্যাপক ও ভয়ংকর আক্রমণ শুরু হলো। যজ্ঞ দ্বারা শামুকগুলিকে বশে আনা গেল। কিছু শামুক তাদের স্বাভাবিক কাজ করে চলেছিল কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না।[১১]

অসুস্থ মুরগীর উপর পরীক্ষা–

"অ্যাগ্রো বিজনেস" র ছয়টি বয়স্ক, অসুস্থ ও দুর্বল মুরগীদের উপর যজ্ঞভস্মের পরীক্ষা করা হলো। তাদের খাদ্য যজ্ঞ ভস্ম মিশিয়ে এবং তাদের শরীরের উপর ছিটিয়ে দেওয়ায় ক্রমশ তাদের অবস্থার উন্নতি হলো। সবাই আবার ডিম দিতে শুরু করল। দুটি মুরগী তাদের ডিমের উপর বসে তা দিতে লাগল এবং সেগুলি থেকে বাচ্চাও বের হলো। এইভাবে, সঙ্কর মুরগীর ডিমে তা দেবে এবং ডিম থেকে বাচ্চা হবে এটা একটা অস্বাভাবিক প্রায় অসম্ভব ঘটনা বললেও চলে।

১৪.মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর যজ্ঞের প্রভাব :

ইউ.এস.এ., চিলি, পোল্যান্ড, পশ্চিম জার্মান ইত্যাদি দেশে মাটির

বৈশিষ্ট্যের উপর যজ্ঞের কার্যকর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে ইউ.এস.এ.-র পিটার টোম্পকিন্স এবং ক্রিস্টোফার বার্ড নামক লেখকদ্বয় অভিজ্ঞ লোকদের সাক্ষাৎকার নিয়ে "সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস্" নামক বিখ্যাত বইটি লেখেন যেটি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত বইদের মধ্যে অন্যতম। এই পুস্তকের প্রকাশন জুন, ১৯৮৯ সনে "হার্পার অ্যান্ড রো" (নিউইয়ার্ক) করেছিল। এই বইটির পৃষ্ঠা ২৪৪-২৫১ এ বর্ণিত অধ্যায়ে যজ্ঞ চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা করা হয়েছে।

বাল্টিমারের (ইউ.এস.এ) 'পরমধামে' এই দু'জন লেখক অগ্নিহোত্রের (যজ্ঞের) প্রচারক সন্ত বসন্ত পরাঞ্জপের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রী বসন্ত এঁদেরকে যজ্ঞের অনেক আশ্চর্যজনক তথ্য ব্যাখা করে বলেন। জন ব্রাউন ও নোনী ফোর্ড মন্তব্য করেছেন যে, হোমকৃষি দ্বারা উৎপাদিত আলুর রং ও স্বাদ অত্যন্ত পছন্দসই হয়। খরা ও হিমপাত সত্ত্বেও তাঁরা রসাল আড়ু, চুকন্দর, নাশপাতি ও আপেলের ভাল ফলন পেয়ে আসছেন। জন ব্রাউন বলেন যে, হোমকৃষি দ্বারা তাঁরা উচ্চতর শ্রেণির ফসল উৎপাদনে সমর্থ হয়েছেন এবং এর জন্য কোনো রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও ঘাসনাশক ওষুধের ব্যবহার করা হয়নি।

রোবিঞ্জের (যুগোস্লাভিয়া) বিজ্ঞানী তাঁদেরকে বলেছেন যে, যখন তাঁরা তামার পিরামিড পাত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আহুতি প্রদান করেন তখন তার আশে পাশে রেডিও সক্রিয়তার প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। চেরনোবিল (রাশিয়া) দুর্ঘটনার পর এটা একটা অসাধারণ তথ্য। এর ফলে যুগোস্লাভিয়ার জীব বিজ্ঞানীরা অনুপ্রাণিত হলেন এবং তাঁরা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এবং অনুকীট বিশেষজ্ঞ শ্রী ইয়াটো মোড্রিককে রাশিয়ায় এসে যজ্ঞের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালেন যাতে সাধারণ জনতা উপকৃত হতে পারে।

যজ্ঞের দূষণ প্রশমন গুণের ব্যাখ্যা শ্রী ফ্ল্যানেগন এইরকম করেছেন— "গোঘৃত ও গরুজাত সারের সঞ্জৃষ্ট অণু বায়ুমধ্যস্থ প্রদূষককে আক্রমণ করে তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাতে অহানিকারক অণুতে পরিণত করে দেয়"। যেমন— ফিটকারী ইত্যাদি দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করলে জলমধ্যস্থ নির্মলতারোধক দ্রব্য ঘনীভূত হয়ে তলদেশে পতিত হয় এবং জল বিশুদ্ধ হয়ে যায়। নিম্নে পতিত হয়ে এইসব অণুগুলি মাটিতে ক্ষার ভাবের বৃদ্ধি করে এবং যদি এই অণুগুলি কোনো গাছের পাতার উপর পড়ে তাহলে প্রয়োজনমত পুষ্টি সাধক উৎস হিসাবে কাজ করে। এসব এইজন্য হয় কেননা প্রাকৃতিক দিক দিয়ে গরুজাত ঘৃত ও সার থেকে উদ্ভূত ধোঁয়া বিদ্যুৎ আবেশমুক্ত হয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুরের ডঃ মিশ্র এবং ডঃ বি.আর.গুপ্ত ১৯৮৯ সনে "ম্যান, এন্‌ভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অগ্নিহোত্র" নামক পুস্তকে ভারতের অন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ডঃ নীলরত্ন ধরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, যজ্ঞভস্ম মাটিতে ছড়ালে কিছু আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে যার দ্বারা বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আলদা হয়ে মাটিতে পৌঁছে যায়। এইভাবে বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের যজ্ঞভস্ম সাহায্য করে।

শ্রী বসন্ত পরাঞ্জপে "হোমো-থেরাপি আওয়ার লাস্ট চানস" নামক একখানি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। সেটি ফাইন ফোল্ড পথ ই ল্‌কোঃ মেডিসিন (ইউ.এস.এ) ১৮৯৬ সনে প্রকাশিত করেছিল। এই পুস্তকে বায়ু ও মাটি ইত্যাদি দূষণ রোধে যজ্ঞের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছিল। যজ্ঞ চিকিৎসা পদ্ধতি চিলি, ইউ.এস.এ, পোল্যান্ড ও জার্মান এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, সেখানকার কৃষকরা রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার ছাড়া ভাল ফসল তৈরি করা শুরু করে দিয়েছেন।

উক্ত বইটিতে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞের বায়ুতে কেঁচোদের সংখ্যা বেড়ে যায়। যজ্ঞবায়ুতে কেঁচোদের হরমোন নিঃসরণ হয়। তার ফলে মাটিতে আর্দ্রতা উৎপন্ন হয় যা মাটির পক্ষে উপকারী। এটি তর্কাতীতভাবে প্রতিপন্ন সত্য ঘটনা যে, হোমকৃষি সস্তা, এর দ্বারা স্বাস্থ্যেপযোগী পুষ্টিকরতত্ত্ব সমন্বিত ফসল উৎপন্ন হয় এবং ফসলের উৎপাদন মাত্রায় বৃদ্ধি হয়।

১৯৮৭ সনের জানুয়ারী মাসে ইউ.এস.এ র একজন রসায়নবিদ্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করেছেন যে, যজ্ঞভস্ম সমন্বিত মৃত্তিকা ফস্‌ফেটহীন হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যজ্ঞকৃষি দ্বারা প্রাপ্ত সুপরিণামের প্রচার হচ্ছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে অবস্থিত আন্দিজ পর্বতে ফ্রান্সস্কো পেরনান্ডিজ নামক ব্যক্তি বেশ কয়েক বছর ধরে হোমকৃষি করেছেন। তাঁর উদ্যানে কমলালেবু, লেবু, আঙুর, ট্যাঞ্জেরিন্স, আড়ু, নাশপাতি, খুবানি, আপেল, বাদাম, এভেক্যাডোস ও বেদানার গাছ আছে। এসবের উপর যজ্ঞের ভাল প্রভাব পড়েছে। কয়েকটি গাছ এক বছরেই ফল ধরতে শুরু করেছে।

যে স্থানে প্রতিদিন যজ্ঞ হতো তার কাছেই 'কেনেডিল বরওয়া নেগ্রা' জাতির

গম বপন করা হলো। জমিতে যজ্ঞভস্ম মিশ্রিত করা হলো না। শুধু যজ্ঞ থেকে উদ্ভূত বায়ু চারাগাছ পর্যন্ত পৌঁছাত। এইটুকু প্রক্রিয়ার ফলে গম গাছের উচ্চতা, সাধারণের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল এবং গমের ফসলও দুগুণ হলো।

লিমা বিনের (একপ্রকার শিম) উপর যজ্ঞভস্মের পরীক্ষা করায় সেই গাছের উচ্চতা ১.৬ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল যদিও সাধারণ ক্ষেত্রে এর উচ্চতা ০.৮ মিটার হয় (ইউ.এস.সৎসঙ্গ ১২/১৮-১৯, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫)।

টমাটোর অপরীক্ষিত বীজের গবেষণাকালে গাছে ফুল আসার সময়, দেখা গেল গাছটি জোন নামক ব্যাকেটরিয়ার আক্রমণের শিকার হলো। সালফারের কোন প্রভাব পড়ছিল না। অতএব যজ্ঞভস্ম প্রয়োগ করা হলো। তাতে ফলের স্বাদ ভাল হলো এবং ফসলের পরিমাণও বেড়ে গেল।

চুকন্দরের চাষ সাধারণত সমুদ্রের কাছের জমিতে হয় কিন্তু তিনি দু-হাজার মিটার উচ্চতায় এর ফসল উৎপন্ন করলেন। সেগুলি আকারে বড় ও স্বাদিষ্ট হয়েছিল। এটা যজ্ঞকৃষির আর একটা সাফল্য।

পরীক্ষার আগের বছরে নাশপাতির ফসল "গ্রেফোলিটা" নামক অণুকীট দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পরের বছর যজ্ঞকৃষির টেকনিক গ্রহণ করা হলো। এর ফলে সুন্দর ও বড় আকারের ফল পাওয়া গেল। স্বাদ ভাল এবং ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়েছিল।

আঙুরের ফসলে টমাইট্স নামক অণুকীটঘটিত রোগ হওয়ায় কীটনাশকের সাথে ফসফরাস ব্যবহার করায় বড় অণুকীটগুলি নষ্ট হলো বটে কিন্তু লার্ভাগুলি নষ্ট হলো না। যজ্ঞভস্মের তরল গাছের উপর ছড়ালে অণুকীটের ডিমগুলির সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল (ইউ.এস সৎসঙ্গ ১২/১৮-১৯, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫)।

১৫.যজ্ঞ ও কিরলিয়ান ফটোগ্রাফী :

প্রতিটি লোকের মধ্যে মনের শক্তি বিদ্যমান কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ লোকেরা সে শক্তি সম্বন্ধে অবহিত নয়। এই সুপ্ত শক্তিকে সক্রিয়, জাগ্রত বা প্রকাশিত করতে হলে কোনো সাধন বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। সেই সাধন বা মাধ্যম যজ্ঞ হতে পারে। বিশ্বখ্যাত বই 'ফ্রম ম্যাজিক টু সাইকোটোনিকস্'-র রচয়িতা পোলান্ড

দেশীয় শ্রী লেক এমফোজি স্টিফেন্সকি পোলাণ্ডের রেডিএথিসিয়া সোসাইটি-র ১৯৭৬ সন থেকে অধ্যক্ষ। ১৯৮১ সনে যখন যজ্ঞের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তখন থেকে যজ্ঞ সোসাইটির একটা ভিন্ন বিভাগ হয়ে গেছে যার কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে আছেন শ্রী এস. গোজডজিক। ১৯৮৩ সনে বার্সায় অনুষ্ঠিত সোসাইটির অধিবেশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে যে, পশ্চিম জার্মানের ডঃ উর্লিক বর্ক মানুষ ও গাছপালার উপর যজ্ঞের সুফল ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন। বার্সার শ্রী ক্রিস্টিয়ানো ওজরোস্কা স্নায়ুতন্ত্র ব্যবস্থায় গোলযোগ, হাঁপানি, চর্মরোগ, চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়রোগের চিকিৎসা প্রাপ্ত সাফল্যের বর্ণনা করেছিলেন (ইউ.এস.সৎসঙ্গ, ১০/১১ অক্টোবর, ১৯৮৫)।

শীলা অস্ট্রান্ডার এবং লিন শ্রীডর দ্বারা রচিত "সাইকিক ডিস্কভারিজ বিহাইন্ড দি আয়রন কর্টেন" নামক পুস্তকে 'মানব তেজ শক্তির' কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিশ্র, ভারত, গ্রীক ও রোমে উপলব্ধ দেবতাদের মূর্ত্তিদের চারিদিকে বা তাদের মুখগুলির চারিপাশে একটি আলোক বৃত্ত (তেজ বা দীপ্তি) লক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী শ্রীমতী আইলিন গ্যারেট তাঁর বিখ্যাত 'অ্যাওয়ারনেস' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, "আমি প্রতিটি গাছ, পশু ও মানুষকে একটা অস্পষ্ট আবরণ দ্বারা পরিব্যপ্ত দেখেছি। দর্শনের চিরবৃত্তি অনুসারে এই আবরণের বর্ণ ও ঘনত্ব পরিবর্তন হতে থাকে"। রোগ, চিন্তা, মানসিক অবস্থা, চিন্তন ও পরিশ্রম ইত্যাদির প্রভাব এই সূক্ষ্ম এনার্জির আকারের উপর পড়ে। যার ফলে তার আচ্ছাদিত তেজপুঞ্জ প্রভাবিত হয়।

হাই ফ্রিকোয়েন্সি (পঁচাত্তর হাজার থেকে দুই লাখ দোলন প্রতি সেকেন্ড পর্যন্ত) বিদ্যুৎ প্রভাব মুক্ত ক্ষেত্রে রাখা হলে মানবের এই তেজপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার ফটোও নেওয়া যেতে পারে। মানব তেজশক্তির কল্পনাকে সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সনে ক্রাস্নোডাসের (রাশিয়া) সেময়োন ডেভিডোভিচ্ কিরলিয়ান নামক বিজ্ঞানী বাস্তবায়িত করলেন। তিনি কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির এই কৌশলকে সম্প্রসারিত করলেন। এই কৌশলের মাধ্যমে জীবিত পদার্থগুলির মধ্যে জীবন সংরচনার অন্তর্নিহিত অবস্থার সংকেতগুলি উজ্জ্বল, অস্পষ্ট বা রঙের ঝলকরূপে পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়ান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ আগ্রহ সহকারে এটি বিবিধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার উদ্দেশ্যে অধিকতর বিকশিত করেছেন।

রোডেলফ জেলের (পশ্চিম জার্মান) মেথিয়াস ফেহরিঞ্জর যজ্ঞভস্ম ও কিরলিয়ান ফটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা দীর্ঘ শৃঙ্খলা সম্পাদনা করেছেন।

মনের বিভিন্ন অবস্থায় একটি লোকের তিন দিনের সাধারণ পরিস্থিতিতে, তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তিনটি কিরলিয়ান ফটোগ্রাফ দেওয়া হলো। এই রকম তিন দিনের কিরলিয়ান ফটোগ্রাফ আবার নেওয়া হলো। তখন অবশ্য সেই লোকটি তাঁর মুষ্টিতে যজ্ঞভস্ম চেপে রেখেছিলেন। জানা গেল যে, প্রথমবার কিরলিয়ান ফটোগ্রাফের তুলনায় দ্বিতীয় বারের ফটোগ্রাফ, যজ্ঞভস্ম হেতু, বেশী এনার্জি যুক্ত ছিল এবং আভামন্ডলও প্রখর ছিল।

এই প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, মানব ও উদ্ভিদের উপর যজ্ঞের সার্থক প্রভাব পড়ে। যজ্ঞ দ্বারা সংঘটিত উপকারে প্রভাবিত হয়ে পৃথিবীর চারটি দেশ— ইউ.এস.এ, চিলি, পোলান্ড ও জার্মানে যজ্ঞ সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাজ ও প্রচার দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি ভ্রম নিরসনঃ-

কিছু শিক্ষিত লোকেরা বলেন যে, যজ্ঞ করলে কাষ্ঠাদি আগুনে পোড়ালে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ফলে বায়ু দূষিত হয়। তাঁরা জানেন না যে, পৃথিবীতে বহুপ্রাকৃতিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সেজন্য গ্যাস উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য ঠিকই থাকছে। যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা দূষণ সৃষ্টিকারী অণু ভেঙে ক্ষতিকারকহীন অণুতে পরিণত হয়। অতএব যজ্ঞের গ্যাস থেকে ক্ষতি কম কিন্তু যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা লাভ হয় বেশি। দূষণ মুক্ত করার জন্য যজ্ঞ থেকে বেশি ভাল ও সস্তা প্রক্রিয়া এখনও কারও জানা নেই।

১৬. যজ্ঞের মহিমা :

"যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্" (অর্থববেদ ২০/১৭/৫)

(যজ্ঞ করায় ঐশ্বর্য ও সুখের বৃদ্ধি হয়)।

"যজ্ঞং তপঃ" (তৈতরীয় আরণ্যক) অর্থাৎ যজ্ঞ করা সর্বোত্তম কর্ম (তপ)।

মনুস্মৃতি (৩/৭৬) মতে "অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যালোক পর্যন্ত যায়। যজমান যজ্ঞের কয়েকগুণ ফলপ্রাপ্ত হয়।"

যজ্ঞ দ্বারা প্রাণের শুদ্ধি হয়। এইজন্য যজুর্বেদে (৯/১২) যজ্ঞকে অমৃত বলা হয়েছে।

কিছু লোকেরা 'স্বর্গকামো যজেৎ' অর্থাৎ যজ্ঞকে স্বর্গ প্রান্তির সাধন মনে করেছেন।

অথর্ববেদে (২/১১/৬) বলেছেন—"যজ্ঞের দ্বারা নির্মল বায়ু সেবন করলে প্রাণী বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নীরোগ ও সুখী জীবনযাপন করতে পারে।"

অথর্ববেদে (১৯/৩৮/১) যজ্ঞ চিকিৎসার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ দ্বারা যক্ষ্মারমত ভয়ংকর রোগও নিরাময় হয়।

শাস্ত্রে, 'স্বর্গকামো যজেৎ', 'অন্নকামো যজেৎ', 'ধনকামো যজেৎ', 'পুত্রকামো যজেৎ' এবং 'আয়ুস্কামো যজেৎ' শব্দনিচয় দ্বারা যজ্ঞকে সমস্ত ঐশ্বর্যপপ্রদাতা বলা হয়েছে।

অথর্ববেদে (১২/২/৩৭) সতর্ক করা হয়েছে যে, যজ্ঞ ছাড়া অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

অথর্ববেদে (১৮/৪/২) মতে যজ্ঞকারী ব্যক্তি সুখ ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে পৌঁছে যায়।

বেদ যেখানে বৃক্ষাদি রোপন করার আদেশ দিচ্ছে সেখানে, "শনু সন্তু যজ্ঞাঃ (ঋগ্বেদ ৭/৩৫/৬) অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা সুখদায়ী বায়ুমণ্ডল নির্মাণ হেতু পদ্ধতিও বলেছে।" সমিধাগ্নিং দুবস্যত ....হব্যা জুহোতন (যজুবেদ ৩/১) মন্ত্রে ভেষজ বায়ু দ্বারা আবহাওয়া পরিশোধক যজ্ঞের দ্বিতীয় পদ্ধতি বর্ণনার সময় নির্দেশ দিচ্ছে যে, ছালযুক্ত যজ্ঞ সমিধাগুলিকে ঘৃতের আহুতিতে প্রজ্জ্বলিত করে তদ্বারা হবি পদার্থের আহুতি প্রদান করে। তাহলে আবহাওয়া পবিত্র হবে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সৃষ্টি বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান,আবহাওয়া পরিশোধক বিজ্ঞান, ভেষজ বায়ু চিকিৎসা বিজ্ঞান, মন্ত্র বিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যজ্ঞ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। অতএব যজ্ঞ একটি মহাবিজ্ঞান।

সুতরাং শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতিকামী প্রতিটি লোকের প্রতিদিন অবশ্যই যজ্ঞ করা উচিত।

১৭. গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. "অথর্ববেদ" টীকা— ক্ষেমকরণ দ্বিবেদী। সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা, দিল্লী।

২. "জ্ঞানসুধা", ভাগ-৭, হেমরায়না। পৃষ্ঠা-৯১, অম্বর প্রকাশন, দিল্লী।

৩. "তপোভূমি" (মাসিক) এপ্রিল, ১৯৮৭, তপোভূমি, মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

৪. "পরম সদগুরু", মাধবজি পোতদার, ১৯৮২। প্রকাশক- নলিনী মাধবজি, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ।

৫. "অগ্নিহোত্র", মনোহর মাধবজি পোতদান। ইনস্টিটিউট ফর স্টাডিজ ইন বৈদিক সানন্সেজ, অক্কলকোট, মহারাষ্ট্র।

৬. "ঈশ্বর উপাসনা বিধি", ডঃ বেদপ্রকাশ, ১৯৮৬, বৈদিক ধর্ম রক্ষা সভা, মেরঠ, উঃ প্রদেশ।

৭. "পাবমানী" (ত্রৈমাসিক), ভাগ-২, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, গুরুকুল প্রভাত আশ্রম, মেরঠ।

৮. "রোল অফ এনভায়রণ মেন্টাল ফ্যাকটার্স। কার্সিনোজেন্স ইন দি কমনলি অকারিং ক্যান্সার অফ দি এলিমেন্টারী এ্যাণ্ড রেস্পিরেটরি ট্রাক্টস্ ইনদি কান্ট্রি", এন.নোতনী পেরিন। প্রোসিডিংস অফ সিম্পোজিয়ম অন এনভায়রণ মেন্টাল মিউটাজিনোসিস অ্যান্ড কার্সিনোজিনেসিস, ১৫ তম অ্যানুয়াল কনফ্রেন্স অন এনভায়রণ মেন্টাল মিউটাজিনিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, বি.এ.আর.সি.বোম্বে, ১৯৯০, ১০৫।

৯. "সংস্কার বিধি", স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৯৭১। রামলাল কপুর ট্রাস্ট, বহালগঢ়, হরিয়ানা।

১০. "ইউ.এস.সৎসঙ্গ", (মাসিক) ইউ.এস.এ।

১১. "অগ্নিহোত্র যজ্ঞ", স্বামী বিবেকানন্দ সরস্বতী। গুরুকুল প্রভাত আশ্রম, ভোলাঝাল, মেরঠ, উঃ প্রদেশ।

১২. "ক্রিয়েটিং আইডিয়াল সোসাইটি"। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্ভান্সমেন্ট অফ সাইন্স অফ ক্রিয়েটিভ ইন্টেলিজেন্স, জার্মান, ১৯৭১।

১৩. "তপোভূমি", (মাসিক), ডিসেম্বর, ১৯৮৭। 'তপোভূমি', মথুরা, (উত্তর প্রদেশ)।

সত্যকে গ্রহন করতে এবং অসত্যকে পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকিবে

- মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

প্রাপ্তিস্থান

১) আর্য্য সমাজ কলিকাতা, ১৯ বিধান সরনী, কলিকাতা - ৬।
২) বঙ্গ - আসাম আর্য্য প্রতিনিধি সভা, ৪২ শংকর ঘোষ লেন, কলি-৬।
৩) শান্তি মন্ডপ বৈদিক প্রতিষ্ঠান, নেতাজীনগর, পূর্ব মেদিনীপুর।
৪) মহাত্মা প্রেমভিক্ষু বানপন্থী, আর্য্যসমাজ, বাসুদেবপুর, পোঃ- ধারেন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর।
৫) নিরঞ্জন কুমার রায় আর্য্য, আর্য্য সমাজ, লোহাগঞ্জ, পোঃ- কাঁটাবাড়ী, কুশমুন্ডি, দঃ দিনাজপুর।
৬) বান্ধব পুস্তকালয়, বড়বাজার, মেদিনীপুর।
৭) মল্লিক বুক্‌স, বড়বাজার, মেদিনীপুর।
৮) মল্লিক পুস্তকালয়, বড়বাজার, মেদিনীপুর।

ওম্ শান্তি !